শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য।

মহাকাব্য

অর্থাৎ

শ্রীমেহের-নিবাসী শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্য-
মহাভাগের অদ্ভুত সাধন ও অলৌকিক
সিদ্ধিলাভ-বৃত্তান্ত এবং নানাবিধ
ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব সংব-
লিত ভক্তিরসাত্মক
গদ্যপদ্যময়
উপন্যাস-
গ্রন্থ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং ৩৪১১
কলিকাতা।
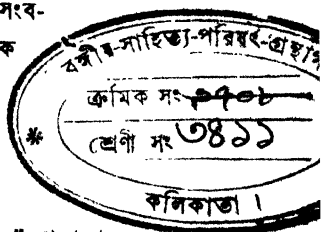
"রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত"-প্রণেতা

শ্রীসরোজনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বিরচিত।

—•—

কলিকাতা।
৪০ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্ হইতে
জি, এন্, মুখার্জ্জি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

[মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।

"শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য"

ভক্তিরসাত্মক গদ্যপদ্যময় উপন্যাস গ্রন্থ।

মূল্য ৷৵০ আনা।

শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত

এই অপূর্ব্ব অভিনব গ্রন্থ সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের অভিমত :—

হিতবাদী—৫ই চৈত্র, ১৩২১। "* * * গ্রন্থকার হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বিশদভাবে বুঝাইয়া সাকারোপাসনার উপযোগিতা সপ্রমাণ করিয়াছেন। বর্ণনায় লেখকের বিশেষ কৃতিত্বই প্রকাশ পাইয়াছে। * * * কবিতাগুলিও তাঁহার কবিত্বের নিদর্শন। * * * আমরা শ্রীশ্রীমেহারমাহাত্ম্য পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি।

বঙ্গবাসী—৬ই চৈত্র, ১৩২১। "* * * লিপিপদ্ধতিতে একটা নূতন ঢং আছে। ভাষা মার্জ্জিত, সরস ও সরল। সর্ব্বানন্দের জীবন-কাহিনী কহিতে গ্রন্থকার সুচারু ভাষাভঙ্গিতে ধর্ম্মতত্ত্ব কহিয়াছেন। এ গ্রন্থ সত্য সত্যই সুপাঠ্য। এমন গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্য হয় কি? এখন ত আর সেকাল নাই।"

The Bengalee—March 27, 1915.—"Mehar-mahatmya is a novel based on what is called by the author as the supernaturtl experiences of this famous devotee (Sarvananda Sarvabedya). * * * * Many problems of profoundly spiritual significance have been treated in this book. Its readers will therefore find this publication at once a charming book of romance and a repository of learned theological discussions. Already well-known as the author of the "Life of Ramesh Chandra Dutt" in Bengali, the writer Babu Sarojnath adds to his credit one more coveted laurel in the Bengali Literature.—"বেঙ্গলী—(বঙ্গানুবাদ) শ্রীশ্রীমেহারমাহাত্ম্য শ্রীমৎসর্ব্বানন্দ সার্ব্ববেদ্য নামক প্রসিদ্ধ মহাপুরুষের সাধন ও সিদ্ধিলাভ বিষয়ক একখানি নবন্যাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বহুবিধ গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে; একারণ গ্রন্থখানি যুগপৎ নবন্যাসের অলৌকিক মনোহারিত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক মীমাংসা, এই

উভয়বিধ রত্নের আকারস্বরূপ হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গ ভাষায় "রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত" গ্রন্থ লিখিয়া সুধীসমাজে সুপরিচিত ; এইবার তিনি বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে পুনরায় বহুজন-বাঞ্ছিত জয়মাল্য লাভ করিলেন সন্দেহ নাই।

আনন্দবাজার পত্রিকা— ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।—"* * * বর্ণনা এরূপ লিপি-কুশলতার পরিচায়ক যে গ্রন্থখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। গ্রন্থে অলৌকিক শক্তির লীলা এবং ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের সমাবেশ হইয়াছে। ভাষা সরস সুন্দর মার্জ্জিত এবং অভিনব। রচনারীতির একটি নূতন লীলা-প্রবাহ আমরা এই গ্রন্থে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং গ্রন্থখানি যে সর্ব্বাংশেই হিন্দুজনসাধারণের সুপাঠ্য এবং আলোচ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও একটি বিশেষ কথা এই যে, গ্রন্থকার মেহার-মাহাত্ম্যের বর্ণনাচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন এবং তৎসম্বন্ধে সংশয়াত্মক ব্যক্তির সংশয় জাল ছিন্ন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিয়া সাধারণের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।"

The Amritabazar Patrika—May 8, 1915.—"* * * * As the author of the 'Life of Ramesh Chandra Dutt,' Babu Sarojnath Mukhurji has acquired a name in the field of Bengali literature, and this new contribution is sure to earn him fresh literary reputation. * * *" অমৃতবাজার পত্রিকা (বঙ্গানুবাদ)—শ্রীমৎ সরোজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় 'রমেশচন্দ্র দত্তের জীবন-চরিত' লিখিয়া ইতঃপূর্ব্বেই বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে খ্যাতনামা। এই নূতন গ্রন্থখানি (শ্রীশ্রীমেহার মাহাত্ম্য) আবার তাঁহার এক নূতন কীর্ত্তি, সন্দেহ নাই।"

চব্বিশ পরগণা বার্ত্তাবহ—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২।—"* * * এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, গ্রন্থকার সহৃদয় ভক্ত পুরুষ। ভক্তের নিকট ভক্তের লেখা নিশ্চয়ই সমাদৃত হইবে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইলাম।"

পুস্তক প্রাপ্তির ঠিকানা :—

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং,
৫৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

জি, এন্, মুখার্জি,
৪০ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পিতৃকল্প পূজনীয় অগ্রজদেব—

৺অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায়

মহাশয় শ্রীশ্রীচরণকমলেষু।

দেবাত্মন্,

অগ্রে ইহধামে শুভাগমন, অগ্রেই আবার দিব্যধামে শুভ যাত্রা করিলেন। আমি অধম আজ একান্তই অনাথ পিতৃহীন! একমাত্র ভরসা আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদ। বড়ই ভালবাসিতেন, বড়ই হিতকামনা করিতেন, তাই আপনারই প্রসাদাৎ— আপনারই শিক্ষায় যৎকিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। তাহারই ফলে এই গ্রন্থ রচনা। ইহাতে অপরের অপ্রীতি হইলেও আপনার অপার আনন্দ লাভ হইবে, তাহা আমি নিঃসন্দেহে জানি। তাই আপনার দিব্যচরণ এই সভক্তিচন্দন সামান্য মর্ত্ত্যকুসুমে পূজা করিলাম; দাসের পুষ্পাঞ্জলি শ্রীপাদ-পদ্মে স্থান পায়, ইহাই প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রার্থনা। ইতি

শুভাশীরাকাঙ্ক্ষিণঃ:—

সেবক-শ্রীসরোজনাথ দেবশর্ম্মণঃ।

মুখবন্ধ।

'মেহার-মাহাত্ম্য' মহাকাব্য কিসে?—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। অতএব, এই গ্রন্থ অল্লাধিকমাত্র রসাত্মক বাক্যাবলি-বিরচিত বলিয়া কাব্যনামে অভিহিত হইতে পারে। পরন্তু, শ্রীশ্রীমহাদেবী ও তদীয় মহাভক্তের বিষয় ইহাতে বর্ণিত, এই জন্যেই মহাকাব্য; নতুবা, ইহাতে কিছু মহাকবিত্বের পরিচয় আছে বলিয়া নহে। পুনশ্চ, ইহা অষ্টাধিক সর্গ সমন্বিত, এবং বিবিধ ছন্দোবদ্ধ কতকগুলি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতাও ইহাতে সন্নিবেশিত আছে, ইত্যাদি কারণে ইহা কতক অংশে মহাকাব্য-লক্ষণাক্রান্তও বটে। সংস্কৃত উৎকৃষ্ট কাব্যে যেমন সাধারণতঃ সর্ব্বাদৌ 'শ্রী' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, বাঙ্গালায় তৎপরিবর্ত্তে ইহাতে সর্ব্বাদৌ 'মা' শব্দ প্রয়োজিত হইয়াছে।

বর্ণনীয় বিষয়ের গুরুত্বলঘুত্ববিচারে কোথাও বা সংস্কৃতবৎ কোথাও বা একেবারে প্রাকৃতবৎ ভাষা রচিত হইয়াছে। ভাষাক্ষেত্রে উভয়প্রকারেরই সবিশেষ প্রয়োজনীয়তাই ইহার কারণ। আভিধানিক শব্দগুলি বা বৈয়াকরণিক সমাসগুলির যে অধুনাতন বঙ্গসাহিত্য-গৃহে একেবারেই প্রবেশ-নিষেধ, এই বা কোন্ কথা? বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতসম্পর্ক ভুলাইয়া সম্পূর্ণ একটি উদ্ভট ভাষায় পরিণত করিতে পারিলেই যে বাঙ্গালীর জাতিগৌরব কিছু বৃদ্ধি পাইবে, এরূপই বা কি রূপে বলি?

ভাষাভঙ্গীর সহিত জাতীয় ভাবভঙ্গীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। আমরা আর্য্যজাতীয়, আর্য্যবংশধর, ইত্যাদি বলিয়া গৌরব করিতে চাই, আর্য্যবীর্য্য আর্য্যমর্য্যাদা বজায় করিতে বড়ই অভিলাষী; অথচ আমাদের ভাষাটী ক্রমশঃ যাহাতে আর্য্যভাষার নামগন্ধবিবর্জ্জিত হয়, ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। ইহার গূঢ় মর্ম্ম এই যে, আমরা ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াও, মাত্র সংস্কৃত অভিধান ও ব্যাকরণে সম্যক্ জ্ঞানাভাব হেতু, তুচ্ছ বাঙ্গালা ভাষায় যথা ইচ্ছা গ্রন্থপ্রণয়ন বা যৎতদ্ গ্রন্থের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে পারিব না, এ কথা বড়ই অসহ্য; আল্‌বৎ পারিব! ভাষা উল্‌টাইয়া ফেল সেও স্বীকার, তথাপি আমরা বঙ্গালার ন্যায় একটা নগণ্য ভাষার্থে ব্যাকরণ অভিধানের পাতা উল্‌টাইতে পারিব না। বেকন্, বার্ক্, কার্‌লাইল্ নহে, যে বহুকষ্টে কতক বুঝিয়া, অবশিষ্ট না বুঝিয়াও, শতমুখে বাহবা দিব! বিদ্যাসাগর, মাইকেল্, কালী-সিংহ প্রভৃতির জন্য কে এত কষ্ট স্বীকার করে? অতএব, ওরূপ ভাষায় আর কাজ নাই; ভাষাকে আমাদের জ্ঞানানুসারিণী করিয়া আন, আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির সীমাবদ্ধ করিয়া রাখ। রঙ্গালয় বা সংবাদপত্রের ভাষাই বাঙ্গালার পক্ষে যথেষ্ট; এই রূপই যেন এখন আমাদের মনোভাব। এ ভাবে কিন্তু জাতীয় ভাষার সহিত জাতীয় স্বভাবেরই অধঃপতন সূচনা করে। আবার তাহা বলিয়া সম্পূর্ণ প্রাকৃত ভাষারও একেবারে অপ্রয়োজন নহে। উহাও স্থানবিশেষে সবিশেষ প্রয়োজনীয়।

বিচারপতি পাইলট্ খ্রীষ্টের মস্তকে লিখিয়া দিয়াছিলেন,

'নেস্‌রেথ্‌ নিবাসী যীশু যীহুদিদিগের রাজা'। যীহুদিগণ আপত্তি করিলে তিনি কহিয়াছিলেন,—'যাহা লিখিয়াছি. তাহা লিখিয়াছি।' গ্রন্থবর্ণিত ঘটনাবলীসম্বন্ধে যদি কেহ আমার উপর অতিরঞ্জন, পরিবর্ত্তন বা সঙ্কোচনাদিজনিত দোষ আরোপিত করেন, তাঁহার প্রতিও আমার একমাত্র সবিনয় বক্তব্য,—'যাহা লিখিয়াছি, তাহা লিখিয়াছি।'

অবশেষে নিবেদন, গ্রন্থলিখিত কোন কথায় যদি কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির অন্তরে আঘাত বা ইষ্টের মর্য্যাদালঙ্ঘন করা হইয়া থাকে, তবে তাঁহার নিকট আমি করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি ; অনভিজ্ঞতা বশতঃই এরূপ হইয়াছে ; নতুবা, আমার আদৌ সেরূপ উদ্দেশ্য বা প্রবৃত্তি নহে। ইতি—

কলিকাতা, বিনীত—
ফাল্গুন, ১৩২১। গ্রন্থকারস্য।

অথ গ্রন্থারম্ভে জয়স্তুতিঃ।

জয় জয় কালিকে
জয় গিরি-বালিকে
ত্রিভুবন-পালিকে ত্রিগুণধরে।
রুচিকর-মালিকে
সুচিকুর-জালিকে
শশিকর-ভালিকে সমর-চরে॥

নরকর-ভূষিকে
গরগর-ভাষিকে
ভয়ঙ্কর-হাসিকে ভব-দয়িতে।
রিপুগণ-নাশিকে
ত্রিভুবন-শাসিকে
শিবপুর-বাসিকে শিব-সহিতে॥

ক্ষিতিভয়-হারিকে
স্থিতিলয়-কারিকে
নিরয়-নিবারিকে নটনপরে।
অসিবর-ধারিকে
নিশিচর-চারিকে
সুরনর-তারিকে অশিব-হরে॥

জগদ্ধাত্রি জগদ্‌ভর্ত্রি জয়কালি জয়স্তে।
জগৎকর্ত্রি জগন্মূর্ত্তি জগন্মাতর্নমস্তে॥

পূজনস্তে ন জানন্তে কিং জনাঃ নির্জ্জরাস্তে।
জয়কালি জগৎপালি জগন্মাতর্নমস্তে॥

দুর্গতোঽহং গতো মোহং নতঃ পাদং গতস্তে।
ত্রাহি কালি জগৎপালি জগন্মাতর্নমস্তে॥

জয়কালি জয়কালি জয়কালি জয়স্তে।
জয়মালি জগৎপালি জগন্মাতর্নমস্তে॥

শং বিধেহি জয়ং দেহি জয়কালি জয়স্তে।
পাহি কালি জগৎপালি জগন্মাতর্নমস্তে॥

সততং বিষণ্ণং পতিতং বিপন্নং
ব্যথিতং বিখিন্নং বিমুখং বিশীর্ণম্।
চরণং প্রপন্নং জনমত্বদন্যং
জয়কালি তন্মাং কৃপয়া হি পাহি॥

ইতি গ্রন্থকারকৃতা শ্রীশ্রীমহাদেব্যা জয়স্তুতিঃ সমাপ্তা।

মহাকাব্য

প্রথম সর্গ।

মা-লক্ষ্মী ছোট বৌ।—রান্ধাবাড়া সারিয়া, মা আমার ঠাঁই প্রস্তুত করিলেন। সকলে আসিয়া ভোজন করিতে বসিলেন, ছোট্‌ঠাকুর আসিলেন না। মা অন্নপূর্ণা সকলকে অন্ন দিয়া ব্যস্তভাবে নিজ শয়নগৃহে গেলেন।

এ কি! স্বামী এখনও শয়ান!

সাধ্বী ছোট বধূ স্বামীর চরণ ধারণে মৃদু মৃদু আহ্বান করিতে লাগিলেন; ছোট কর্ত্তা কথাই কহিলেন না। তবে কি নিদ্রিত? না, এই যে নেত্রযুগল উন্মীলিত,—ঈষদ্ বিস্ফারিত, আরক্ত! অধর যেন কিঞ্চিদ্ অধীর, বিকম্পিত!—এই যে, চক্ষুর জলে বালিস্‌টী ভিজিয়া গিয়াছে!

সতীর হৃদয়-হ্রদ সহসা সমুদ্‌বেল হইয়া, নয়নপথে দুইটী ধারা উচ্ছলিত হইয়া পড়িল; মা আমার অঞ্চল চক্ষে দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সহসা অঙ্গনে শব্দ হইল,—'কই রে সব্বা ভাই, ভাত খাচ্চিস্ না কি ?'

সহসা ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিয়া ছোটবধূ শার্দ্দূলনাদ-ভীষিতা হরিণীবৎ চকিতে শয়নগৃহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রন্ধন-শালায় পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

বজ্রগম্ভীরে আবার প্রশ্ন হইল,—'কই, তোমরা ভাত খাচ্চ, সব্বা খাচ্চে না ?'

বটঠাকুর ভোজন করিতে করিতে উত্তর করিলেন,—'সব্বার কথা আর বলো না পুঁয়ে দাদা। সব্বা ভাত খাবে কি, সে আমাদের মুখের ভাতে ছাই দেবার যোগাড় করে তুলেছে !'

পুঁয়ে।—কেন, কি করেছে ?

বটঠাকুর।—আমি এত বারণ করে রেখিছি, বলি, তুই মুখ্যু, লেখা জানিস্ না, পড়া জানিস্ না ; তুই রাজসভায় যাস্ না। কি জানি, রাজাগজার মেজাজ্, কোথা থেকে কি হবে, আর আমাদের শুদ্ধু অন্ন মারা যাবে ; মুখ ত হাস্‌বেই। তা, দেখ, ও আজ প্রাতঃকালে, কাউকে কিছু না বলে, রাজবাড়ীতে গেছে ! মহারাজ মহাসমাদরে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করে-ছেন,—'ঠাকুর, আজ কি তিথি ?'—ও হতভাগা আজ অমাবস্যার দিনে বলে এসেছে,—'মহারাজ, আজ পূর্ণিমা !' আমি শেষে রাজসভায় গিয়ে বেকুফ্ ! মহারাজ অবিশ্যি নিজে কিছু বল্‌লেন না, কিন্তু আর আর সকলে সেই কথা তুলে বিষম পরিহাস ! আমি ত একেবারে লজ্জায় নযযৌ নতস্থৌ ! দেখ

দেখি, কি অপমান ! কি ঘৃণা ! পিতামহ পণ্ডিত, পিতা পণ্ডিত, আমিও তাঁদের প্রসাদাৎ যেন তেন প্রকারেণ দুটা ভাত খাচ্চি, লোকের কাছে একটা প্রণামও পাচ্চি। পাণ্ডিত্য, শুদ্ধাচার, সংযম, সত্যনিষ্ঠা, এই সব দেখেই ত দাসরাজ গঙ্গাতীর থেকে এনে পিতামহ ঠাকুরকে কত সমাদর করে বিত্তি বেহ্মত্তর দিয়ে এ দেশে বাস করিয়েছিলেন ! তা, এই গো-মুখ্যুটার জন্য সে আদর, সে বিত্তি বেহ্মত্তর যে বজায় থাকে এমন বুঝি না। বেল্লিক, গব্যস্রাব, আকাট মুখ্যু, অকাল কুষ্মাণ্ড !—

পুঁয়ে।—তার পর ? সে ভাত খেলে না কেন ?

বট্‌ঠা।—তাই, বড়ই রাগ হোলো। আবার, রাজবাড়ী থেকে এসে দেখি, কি না, কর্ত্তা বাইরের দাওয়ায় বসে ঠ্যাংএর উপর ঠ্যাং দিয়ে তামাক ফুঁক্‌চেন ; উঠনে একটা গোরু এসে ধানগুলো খেয়ে যাচ্চে, সে দিকে নজর নাই ! তাই, রাগের মাথায় ঘা-কতক প্রহার দিয়েছি।

রন্ধন-গৃহাভ্যন্তরে চুল্লীপার্শ্বে আসীনা অবগুণ্ঠনবতী উৎকর্ণা বর-বর্ণিনী মা-জননী ছোটবধূর মস্তকে এইবার যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল ! মা আমার আবার অঞ্চলচক্ষে নীরবে রোদন আরম্ভ করিলেন।

আহা, পতি মূর্খ, তাই রাজসভায় উপহাস, তদুপরি আবার বিষম প্রহার, তাই অনাহার ! সতীর প্রাণ আর কত সহিবে !

পুঁয়ে দাদা উত্তর করিলেন,—'সে ত মুখ্যু-গোরু আছেই, তুমি যে আবার দেখ্‌চি পণ্ডিত-গোরু হলে ! তুমি বড় ভাই

হয়ে এত টুকু সহ্য কর্‌তে পার্‌লে না, আর আমি ত আশ্রিত, পর বই ত নয়, ওর যে কত অসহ্যপনা সহ্য কর্‌লাম, তার কি অবধি আছে! আমি পূর্ণচন্দ্র তোর ঠাকুরদাদার আমল থেকে আছি, তোকেও হাতে করে মানুষ করেছি, ওকেও হাতে করে মানুষ করেছি, আমার অপিক্ষেটা কর্‌লিনে, তুই আগে ভাগেই ওকে মেরে বস্‌লি! তুই বুঝি বড় পণ্ডিত হয়েছিস্? আচ্ছা, তবে ছ্যাখ্!—ওরে সব্বা, সব্বা রে! কই, সে ঝাঁটাখেকো মারধর খেয়ে মোলো কোথা গিয়ে?'—বলিতে বলিতে পূর্ণচন্দ্র ছোট্‌ঠাকুরের শয়নগৃহাভিমুখে চলিলেন। ভোজনোপবিষ্ট বট্‌ঠাকুর কিঞ্চিদ্ অপ্রতিভ হইয়া অধোবদনে প্রকৃত প্রাজ্ঞবৎ নিঃশব্দে স্বকর্ম্মসাধনে নিরত রহিলেন।

———

দ্বিতীয় সর্গ।

গোয়ালন্দ হইতে ষ্টীমারে গিয়া চাঁদপুর নামক একটী ষ্টীমার-ষ্টেশন্ পাওয়া যায়। এই চাঁদপুরের কিয়দ্দূরে মেহার নামক একটী গ্রাম আছে। যখনকার কথা বলিতেছি, তখনও এই মেহার এই স্থানেই ছিল; তবে, এ মেহারে আর সে মেহারে শোভাসমৃদ্ধির বহুল বৈলক্ষণ্য। তখনকার মেহার ছিল দাস-রাজের রাজধানী, এখনকার মেহার দরিদ্রাবাস ক্ষুদ্র পল্লী-মাত্র। কোথা বা সে দাসরাজ, কোথা বা সে শোভা-সমৃদ্ধি! তবে, সে মেহারের বলবৎ দুইটী অভিজ্ঞান এ মেহারে অদ্যাবধি বিদ্যমান, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ্য।

ভগবান্ দিনদেব ক্রমশঃ মেহার রাজধানী অতিক্রমণ পূর্ব্বক অস্তাচলোদ্দেশে চলিত। রাজবাটীর তথা সাধারণ গৃহস্থালয়ের স্ত্রীপুরুষবর্গ আহারান্তে বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনরায় নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত। অনাহারে আছেন কেবল ভট্টাচার্য্য-বাড়ীর আমাদের সেই অবমানিত 'আকাট মুখ্যু' শ্রীমান্ ছোট্‌ঠাকুর, সেই পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী শ্রীমতী ছোটবধূ, আর সঙ্গে সঙ্গে অনাহারী সেই ত্রৈপুরুষিক পরিচারক শ্রীপুঁয়েদাদা।

অবোধ্য বিধির বিচিত্র বিধান, অভেদ্য ভাগ্যের গভীর রহস্য! কেন এ মূর্খতা, কেন এ অবমাননা, কেন বা প্রহার, কি জন্য অনাহার, কোন্ প্রয়োজন, কিসের আয়োজন, কোন্ জন তখন তাহা বুঝিয়াছিল?

ঘড়ী থাকিলে, রাজবাড়ীতে তখন ৪টা বাজে বাজে। নদীকূলে জঙ্গল, জঙ্গলের মধ্যস্থলে একটী সুতুঙ্গ তাল-তরু সারাদিনের সৌরতাপে তাপিত,—যেন অসাড়, অচল, অবাক্ হইয়া দণ্ডায়মান। তরুতলের কিয়দ্দূরে বনমধ্যে কোথা হইতে এক যোগিপুরুষ আসিয়া ধ্যান ধরিয়া বসিয়া আছেন! হায় রে বিধির যোগাযোগ! এইরূপ আকস্মিক যোগাযোগেই সত্য স্বাতীনক্ষত্র-নীর শুক্তিমুখে পতিত হইয়া মুক্তাফল ফলিয়া থাকে। আজ মেহারে সত্যই ততোধিক শুভযোগ সমুপস্থিত!

থপ্ করিয়া যোগীর গায়ে কি একটা পড়িল; অমনি ধ্যান-ভঙ্গ! চাহিয়া দেখিলেন, অসৃগ্-লিপ্ত আমিষ-খণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে তালবৃক্ষের মস্তকে খড়্ খড়্ শব্দে তালপত্র নড়িয়া উঠিল। যোগী দেখিলেন, তরুশিরোভাগে একটি মানব-মূর্ত্তি। যোগী নিস্তব্ধ! বৃক্ষারূঢ় মানব বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্ত হইতে এক এক পেঁচ্ খুলিতেছে, তালবৃন্তধারে ছেদন করিতেছে আর ভূমিতে নিক্ষেপ করিতেছে—ও কি?—সমস্তই আমিষ-খণ্ড। যখন মুণ্ডটী যোগীর সম্মুখে আসিয়া পড়িল, যোগী দেখিয়া বুঝিলেন, বৃক্ষোপরিগত ভীষণ বিষধর বৃক্ষারূঢ় ব্যক্তিকর্ত্তৃক এইরূপে নিহত হইল।

আরূঢ় অবাধে অবরূঢ় হইলে, যোগী নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—'তুমি কে, কেনই বা তালগাছে উঠিয়াছিলে, সাপে ত কামড়ায় নাই?'

উত্তর।—'আমার নাম সব্বা ভট্চায্যি, এই মেহারেই

আমার বাড়ী, আমি লিখ্‌বার জন্য তালপাতা কাটিতে তাল-গাছে উঠেছিলাম ; তা ওই সাপটা বোধ হয় সালিকের ছানা খেতে গাছের মাথায় উঠেছিল, আমাকে দেখে ফোঁস্‌ করে কাম্‌ড়াতে এল ; আমি অম্‌নি খপ্‌ করে ওর টুঁটী চেপে ধর্‌লাম, ত আমার হাতটা সব লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে ধর্‌লো ; আমি আর করি কি, বাঁ হাত দিয়ে এক এক পেঁচ করে খুলে তালের বেগোর ধারে ঘসে ঘসে সাপটাকে সাব্‌ড়ে দিলাম। কাম্‌ড়াতে পারে নাই। কিন্তু, আমার কাতারিখানা কোমর থেকে মাটীতে পড়ে গেল ; তালপাতা কাটা হয় নাই। এইবার আবার কাতারি নিয়ে উঠ্‌বো।'

মহাপুরুষ ব্যাপার শ্রবণে ভট্টাচার্য্যের আপাদমস্তক সমস্তাবয়ব নিরীক্ষণ করিয়া, কিয়ৎকাল ধ্যানস্থ হইলেন। পরক্ষণেই নয়ন উন্মীলিত করিয়া স্নেহমাখা বাক্যে কহিলেন, 'আহা, বড় মার খাইয়াছ! ছোটবধূ মা-জননী আমার অনাহারে পড়িয়া আছেন! পণ করিয়াছ, লেখাপড়া না শিখিয়া জলগ্রহণ করিবে না! ভাল, পুঁয়েদাদা কোথায় ?'

উত্তর।—'সন্নেসী ঠাকুর, তুমি আমার পুঁয়েদাদাকে চেন ? ভাল রে ভাল! আমার পুঁয়েদাদাকে সবাই চেনে! পুঁয়েদাদা লিখ্‌তে পড়্‌তে জানে! সেই ত আমাকে লেখা পড়া শেখাবে, বলেছে। আমায় পাতা কাট্‌তে বলে সে গোরু নিয়ে মাঠে গেছে। সেও রাগ করে কিছু খায় নাই। তাই, আমি গোরু চরাতে যাই নাই। দাদা রেতের বেলা আমাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেবে, বলেছে।'

যোগী।—তোমার বয়স বেশি হয়েছে; লেখাপড়া শিখ্‌তে এখনও অনেক দিন লাগ্‌বে। আমি যা বলি, তাই যদি কর্‌তে পার, তবে তুমি আজ রাত্রির মধ্যেই সর্ব্ববিদ্যায় পণ্ডিত হয়ে উঠ্‌বে।

উত্তর।—'কি, ঠাকুর, বলনা, কি? আমি পার্‌বই পার্‌বো; না হয়, মর্‌বো, সেও স্বীকার! ঠাকুর, আমার মরণও ভাল।'

এইবার 'সব্বা' কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগুরু শ্রীযোগিবরের শ্রীপাদদ্বন্দ্ব করদ্বয়ে ধারণ করিয়া স্বীয় অবনত-মস্তকোপরি স্থাপনপূর্ব্বক বাষ্পগদ্‌গদ ভাষে আবার কহিলেন,—'বাবা, আমার মরণই ভাল।'

জগদ্‌গুরু আশুতোষের এতদিনে মনস্তোষ হইল। এত কালে 'অকাল কুষ্মাণ্ডের' কপাল ফিরিল।

মহাপুরুষ যুবকের কর্ণে শ্রীশ্রীব্রহ্মময়ীর বীজমন্ত্র প্রদান-পূর্ব্বক গোরোচনা দ্বারা তদীয় বক্ষঃস্থলে উহা লিখিয়া দিলেন, এবং কহিলেন,—

'যাও, আর তালপাতা কাটিতে হইবে না। পুঁয়েদাদা সন্ধ্যাকালে বাড়ীতে আসিলে, যদি মনে না থাকে, তাহাকে দিয়া তোমার এই বুকের লেখা মন্ত্র পড়াইয়া লইও। আজ অমাবস্যার নিশা; ওই যে শ্মশানের উপর তিন বৃক্ষটী দেখিতেছ, আজ রাত্রিতে তোমার পুঁয়েদাদাকে সঙ্গে লইয়া ঐ বৃক্ষমূলে আসিয়া, তুমি যদি একটী শবের উপর বসিয়া একাগ্রচিত্তে

অবিরাম এই মন্ত্র জপ করিতে পার, তবে রাত্রির মধ্যেই জগজ্জননীর দর্শন পাইবে, যাহা ইচ্ছা বরলাভ করিতে পারিবে, যত বিদ্যা চাও, তত বিদ্যা লাভ হইবে। যাও, আর কাহাকেও কিছু বলিও না; কেবল পুঁয়েদাদাকে বল গিয়ে।'

সাধুবাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসাপন্ন ব্রাহ্মণতনয় সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত-পূর্ব্বক পুলকিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ চলিয়া আসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাধুরও অন্তর্ধান!

তৃতীয় সর্গ।

ক্রমশঃ সায়ং সমাগত; আর ক্রমশঃ শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র ওরফে পুঁয়েদাদাও বৃন্দাবনের নন্দদুলালের ন্যায় ধেনুবৎস-পুরঃসর গৃহ-প্রত্যাগত। অমনি আমাদের সেই 'আকাট্ মুখ্যু' ছোট্ ঠাকুর, সেই মা-জননী ছোট বধূর পরমারাধ্য পতি-দেবতা, আর এই নবানুরাগ-দীক্ষিত মহাযোগীর মহাভক্ত, হর-গুরুর হরি-শিষ্য, সেই আমাদের সাধের 'সব্বা' অমনি গোপনে গিয়া গো-গৃহাগত পুঁয়েদাদার সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বক্ষোলিপি প্রদর্শন করিলেন।

শ্রবণে দর্শনে পূর্ণচন্দ্রের অনশন-খিন্ন কলেবরে সহসা যেন শতপ্রাণ প্রবাহিত হইল! এতদিনে তাঁহার সেই ত্রৈপুরুষিক মহাসমস্যার মহাসমাধান! এই সেই মহাপুরুষ!

পূর্ণচন্দ্র আজ ছোট্ ঠাকুরকে নীরবে যেন কি এক নূতন দেখা দেখিতেছেন; আর ভাবিতেছেন,—"এই সেই মহাপুরুষ! সেই আমার প্রথম প্রভু, প্রতিপালক, গুরু, ভর্ত্তা, এই সেই মহাপুরুষ! সেই গঙ্গাতীরে বালক আমি উপবিষ্ট, সেই স্নানান্তে গঙ্গাগর্ভে ধ্যানমগ্ন এই আমার কর্ত্তা; সেই সহসা আকাশবাণী—'কামাখ্যায় যাও'! সেই আমি দেবাদেশ-প্রাপ্ত এই কর্ত্তার সহিত পরিচারকরূপে মায়ের অলৌকিক লীলাস্থলী সেই মহাপীঠে গেলাম, সেই আমার এই কর্ত্তা মায়ের মন্দিরে

ধন্না দিলেন ; আহা, সেই তৃতীয় দিবসে সহসা উঠিয়া বলিলেন,—'পুঁয়ে রে, মা বলেছে !' আমি নছোড় হলে, সেই—এই আমার দয়াল কর্ত্তা বলিলেন,—'পুঁয়ে রে, মা বলেছে, আমিই আমার পৌত্ররূপে সত্বরই পুনরায় জন্মিব, সেই জন্মেই মায়ের দর্শনলাভ !' আহা ঠিক্ ! ঠিক্ ! দেশে আসিয়াই কর্ত্তার দেহ-ত্যাগ ! পরে, এই পৌত্রগণের জন্ম। সেই বাল্যকাল হ'তে আশা-বশে সর্ব্বত্যাগী হয়ে আমি ইহাদের অনুগামী। মহাসমস্যায় পড়ে অহোরাত্র ভাব্‌তেছি, এই পৌত্রগণের মধ্যে কোন্‌টী আমার সেই কর্ত্তা ? কোন্‌টীর ভাগ্যে ব্রহ্মময়ীর দর্শনলাভ ঘটিবে ?' আজ আমার সেই মহাসমস্যার সমাধান ! এই আমার সেই কর্ত্তা ! এই সেই মহাপুরুষ ! মহামায়ের মহাবীজাঙ্কিত বক্ষে আমার সমক্ষে এই আমার সেই মহাগুরু দণ্ডায়মান ! অহো ভাগ্য ! অহো ভাগ্য ! আহা রে, আজ বুঝি সেই শুভদিন ! আজ বুঝি ব্রহ্মময়ী সদয়া হ'বেন !"

ইত্থম্ভূত ভাবনাক্রান্ত, অপূর্ব্ব অধ্যবসায়ী, পূর্ব্বসাক্ষী, লক্ষ্মণলক্ষণোপেত পরমসেবক পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রবদন সহসা অশ্রুপ্লাবিত হইল। পূর্ণ নীরব ! সম্মুখস্থ সেই সুসরল শাল-শরীরীর সুবিশাল-বক্ষোলিখিত মহামন্ত্র মনে মনে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতেছেন, আর উপরি-উক্ত রূপ পূর্ব্ববৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অন্তরে অন্তরে আবৃত্তি করিতেছেন। অজস্রস্রোতে গলদশ্রু-গঙ্গা ক্রমশঃ বহিয়া সমুদ্বেল হৃৎসাগর-সঙ্গতা ; তবুও পূর্ণ নীরব !

সরল-প্রাণ 'সব্বা' কান্না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,

—'পুঁয়ে দাদা, কেঁদ না, তোমার আজ সারা দিনটা জল টুকুও পেটে পোলো না! উপবাস ক'রে মাঠে মাঠে রোদে রোদে গোরু রাখা! চল দাদা, ছোট বৌকে ডেকে তুমি ভাত খাও গিয়ে; আমি ত বিছে না শিখে ভাত খাব না! দাদা, তুমি যদি এমন ক'রে না খেয়ে না দেয়ে মারা যাও, ত আমার গতি কি হ'বে?'—বলিয়া অবোধ 'সব্বা' আরও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এইবার জাঙাল ভাঙিল! আর বেগধারণ অসাধ্য। পূর্ণ একেবারে অধীর হইয়া, আকুল হইয়া, প্রকাশ্যে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার সাধনের ধন 'সব্বাকে' আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—'ওরে আমার বাপের ঠাকুর, ওরে আমার মাথার মণি, আমি ম'লে তোমার গতি কি হবে! তাই তোমার ভাবনা! তাই তোমার কান্না!'—বলিয়াই পূর্ণ সেই বাষ্পপ্লাবিত বদনেই অমনি খল খল হাসিয়া উঠিলেন। ধন্য রে কান্না! ধন্য রে হাসি! এ হাসিকান্নার 'বালাই লইয়া মরি!'

ভাব দেখিয়া, 'সব্বা' অবাক্ হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎকাল একটী বিস্ময়সূচক অব্যয়বৎ রূপান্তরবর্জ্জিত হইয়া রহিলেন। চমক ভাঙিলে কহিলেন,—'পুঁয়ে দাদা, তুমি মাঠে কেরু গাঁজার কোল্‌কে টোল্‌কে টানো নাই ত?'

পূর্ণ আরও হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন,—'মাঠে নয়, সেই মহাপীঠে; আমাকে গাঁজা টানিয়েছিস্ তুই সেই মহাপীঠে, —কামাখ্যাপুরীতে। সেই নেশায় আজ তিন পুরুষ ঘুরূচি!

সব্বা রে, এখন, আমি মোলে তোর গতি কি হ'বে, তাই তোর ভাব্না ? তুই বল্, বল্, তুই প্রতিজ্ঞা কর্, আমার গতি আগে কর্‌বি কি না ; বল্, তবে ছাড়্‌বো ; নইলে আমি এই উপবাস ক'রে এইখানে তোর পায়ের উপর মাথা খুঁড়ে মর্‌বো ; বল্, আগে বল্।'

'সব্বা' সহসা ধীরমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার মুখশ্রী-দর্শনে বোধ হইল, মন যেন কোন্ সুগভীর সমুদ্রতলে, কোন্ গুপ্ত পাতাল-তলে ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি সুপ্তমীন সরোবৎ শান্ত, সুগম্ভীর, নীরব, নিস্পন্দ !

পূর্ণচন্দ্রের ততই বাগ্‌গর্জ্জন,—'বল্, শীগ্‌গীর বল্, নয় মর্‌বো, ঠিক মর্‌বো ; বল্, আমার গতি আগে কর্‌বি কি না।'

অন্তস্তলোত্থিত সুদীর্ঘ শ্বাসপুরঃসর সুধীরে উত্তর হইল,—

'হাঁ, কর্‌বো।'

কে জানে, কি বুঝিয়া কি ভাবিয়া 'সব্বার' অভ্যন্তর হইতে এ উত্তর কে করিল !

চতুর্থ সর্গ।

সেই একদিন, আর এই একদিন! সে দিন দ্বাপরে, বৃন্দাবনে, নন্দালয়ে; আর এ দিন কলিতে, মেহারে, ভট্টাচার্য্যগৃহে।

সে দিনেও ব্রহ্মময়ীর দুইটী ছেলে, এ দিনেও ব্রহ্মময়ীর দুইটী ছেলে। সে দু'ভাই কানাই বলাই, এ দু'ভাই 'সব্বা পুঁয়ে'। সে দিনেও সায়ংকাল, এ দিনেও সায়ংকাল। সে রঙ্গও গোষ্ঠালয়ে, এ রঙ্গও গোষ্ঠালয়ে। সে দিনের দর্শক অক্রুর মহাশয়, এ দিনের দর্শক আমি আর আমাদের পাঠক মহাশয়। সে দিন অক্রুর ব্রজে কংসরথে, আমরা মেহারে আজ মনোরথে।

দেখিয়াছিলেন ভাল অক্রুর মহাশয়, না দেখিলাম ভাল আমরা?

হে ভক্ত! হে ভগবন্! তুমি ভাল, না তুমি ভাল?— আমরা জানি না, তোমরা বল।

বাস্তবিক বটে, অক্রূরপক্ষে ব্রজের সে দিন, আর আমাদের 'পুঁয়ে দাদার' পক্ষে মেহারের এ দিন, একইরূপ শুভদিন। অক্রূর শ্রীবৃন্দাবন-গমনে ভাবিয়াছিলেন, আজ আমার ইষ্টলাভ হইবে। অহো, আজ কি সৌভাগ্য! ভগবদ্ দর্শনে, তচ্চরণ-রেণু-স্পর্শনে আজ আমার জন্ম, কর্ম্ম, দেহ, আত্মা সমস্তই সার্থক

হইবে। সর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিয়া শ্রীভগবান্ আমায় কতই করুণা করিবেন।

"অপ্যাঙ্ঘ্রিমূলে পতিতং কৃতাঞ্জলিং
মামীক্ষিতা সস্মিত আর্দ্রয়া দৃশা।
সপদ্যপধ্বস্ত সমস্তকিল্বিষঃ
বোঢ়া মুদং বীতবিশঙ্ক উর্জ্জিতাম্॥" [শ্রীমদ্ভাগবতে]

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীচরণপ্রান্তে পতিত হইব, আমার প্রতি প্রভু সস্মিতে সদয়াবলোকন করিবেন, অমনি আমার জন্মজন্মার্জ্জিত কলুষরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হইবে, আমার ভব-ভয় দূরীভূত হইবে, আমি আজ পরমানন্দলাভে পরিতৃপ্ত হইব।

"অপ্যাঙ্ঘ্রিমূলে পতিতস্য মে বিভুঃ
শিরস্যধাস্যন্নিজহস্তপঙ্কজম্।
দত্তাভয়ং কাল-ভুজঙ্গ-রংহসা
প্রোদ্বেজিতানাং শরণৈষিণাং নৃণাম্॥" [ঐ]

শ্রীপতির পাদপদ্মে হ'ব নিপতিত,
শ্রীহস্ত মস্তকে মোর দিবেন শ্রীনাথ।
কালভুজঙ্গের ভয়ে ভীত হয়ে নর,
চরণে শরণাগত হইলে তাঁহার,
অভয় প্রদান হরি করেন যে করে,
সে কর দিবেন আজ এ দাসের শিরে।

"মমাদ্যামঙ্গলং নষ্টং ফলবাংশ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্তে ভগবতো যোগিধ্যেয়াঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্॥
যদর্চ্চিতং ব্রহ্ম-ভবাদিভিঃ সুরৈঃ
শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ সসাত্বতৈঃ।
গো-চারণায়ানুচরৈশ্চরদ্ ব্রজে
যদ্‌গোপিকানাং কুচ-কুঙ্কুমাঙ্কিতম্॥" [ঐ]

যে শ্রীপাদপদ্ম যোগী সদা করে ধ্যান,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া আজ করিব প্রণাম!
ইথে কি রহিতে আর পারে অমঙ্গল?
সর্ব্বাপৎ শান্তি হ'বে জনম সফল!
যে শ্রীপাদপদ্ম ব্রহ্ম শঙ্কর-পূজিত,
যে শ্রীপাদপদ্ম পদ্মালয়ার অর্চ্চিত,
যে শ্রীপাদপদ্ম বন্দে বৃন্দারকগণ,
মুনিঋষিবৃন্দ আর সাধু অগণন,
যেই শ্রীচরণ নিত্য বিচরণে রত
গোচারণে বৃন্দাবনে অনুচরাবৃত,
ব্রজ-গোপিকার কুচ-কুঙ্কুমেতে মাখা
সে শ্রীপাদপদ্ম আজ পা'ব চক্ষে দেখা!

"দ্রক্ষ্যামি নূনং সুকপোল-নাসিকং
স্মিতাবলোকারুণ-কঞ্জ-লোচনম্।

মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈ মৃগাঃ॥" [ঐ]

দেখিব সে চাঁদমুখ মুকুন্দের আজ,
সুন্দর সে নাসা যাহে নিন্দে খগরাজ ;
সুগণ্ড মণ্ডিত মরি মকর-কুণ্ডলে,
অধরে মধুর হাসি, ত্রিভুবন ভুলে ;
অরুণ-নয়ন আঁকা করুণা-তুলীতে,
ত্রিলোক করেছে আলো অলকাবলীতে ;
দেখিব সে চাঁদমুখ দেখিব নিশ্চয়,
লক্ষণে লক্ষিত আজ মম ভাগ্যোদয়।—
রহিয়া রহিয়া নাচে দক্ষিণ নয়ন,
প্রদক্ষিণ করে মোরে যত মৃগগণ।

পূর্ণচন্দ্রও আজ প্রেমে বিভোর! সেই বাল্যবয়সে রাঢ়-দেশে তিনি এই ভট্টাচার্য্য-পরিবারে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন; কর্ত্তার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়া, অকস্মাৎ আকাশবাণী শুনিয়া তাঁহার বিস্ময়োৎপত্তি হইয়াছিল। পরে, শ্রীশ্রী৺ কামাখ্যাপুরীতে কর্ত্তার প্রমুখাৎ দেবীর আদেশবাণী শ্রবণে আশার সঞ্চার!

পূর্ণের মনে কি আশা? আশা,—"কবে কর্ত্তা মৃত্যু-অন্তে পুনর্ব্বার স্বপুত্রৌরষে পৌত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করিবেন; কবে সেই পৌত্র বয়ঃপ্রাপ্তে পূর্ব্বপ্রাপ্ত অপূর্ব্ব দৈবাদেশানুসারে

শ্রীশ্রীমহাদেবীর দর্শনলাভে চরিতার্থ হইবেন! কবে সেই শুভদিন আসিবে! আমি সেই অলৌকিক লীলা স্বয়ং দেখিব, শুনিব; আর যদি ভাগ্যে ঘটে, ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে, ইঁহার প্রসাদাৎ, যোগে যাগে, কোন না কোন প্রকারে, প্রাণপাতেও যদি একবার কৃপাময়ীর কৃপাদৃষ্টি পাই!"

এই আশায়,—সুদূরপরিদৃশ্যমান কুয়াসার ন্যায় ছায়াকার এই সু-আশার বশবর্ত্তী হইয়াই,—পূর্ণচন্দ্র সেইকাল হইতে এইকাল পর্য্যন্ত, সেই পিতামহ হইতে এই পৌত্রগণ পর্য্যন্ত, সেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী রাঢ়দেশ হইতে এই পূর্ব্ববঙ্গের মেহার-রাজধানী পর্য্যন্ত, এই ভট্টাচার্য্য-গোষ্ঠীর অনুগামী, অনুবর্ত্তী, আজ্ঞাকারী সেবক। ধন্য পূর্ণের আশা! ধন্য পূর্ণের অধ্যবসায়! ধন্য পূর্ণের সেবা! আজ বুঝি সকলই সম্পূর্ণ হয়!

"সর্ব্বা'র হৃদয়াকাশোদ্ভাসিত মন্ত্র-সুধাকর-সন্দর্শনে, তৎ-প্রমুখাৎ মহাপুরুষ-প্রদত্ত আদেশোপদেশ শ্রবণে পূর্ণের মনে নিঃসংশয় প্রতীতি জন্মিল যে, এই তাঁহার সাধের 'সর্ব্বা'ই সেই তাঁহার পুরাতন কর্ত্তা, সুতরুণ পৌত্রীভূত সেই প্রাচীন পিতামহ। আরও, সন্ন্যাসী কহিয়াছেন,—'এ মন্ত্র মাত্র পুঁয়ে দাদাকে দিয়া পাঠ করাইও, এই সকল কথা কেবল পুঁয়ে দাদাকেই কহিও, এই কার্য্য পুঁয়ে দাদাকে সঙ্গে লইয়া করিও';—এ সংবাদ শুনিয়া পূর্ণচন্দ্রের আশাবল্লী এককালে শতমুখী হইয়া উঠিল। কেন না তিনি আজ অক্রূরবৎ আশানন্দে ভাসিতে থাকিবেন? কেন না তিনিও মনে মনে কহিবেন—'দ্রক্ষ্যামি নূনমিত্যাদি'?

পঞ্চম সর্গ।

বুঝিলাম, হ্রস্বে দীর্ঘে কতই প্রভেদ!

হে 'দি'ননাথ, তুমি 'দী'ননাথ কখনই নও। সেই সত্যযুগে, যে দিন দুর্জ্জয় দৈত্যপিতার নিদারুণ দণ্ডাজ্ঞায় সেই ভগবৎ-প্রেমের নবনীত-পুত্তলী পাষাণপীড়িত হইয়া পর্ব্বতচূড়া হইতে মহার্ণবে নিপাতিত হইল, যখন দিবাবসান জানিয়া বিপন্ন বেপমান-বপু ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহাশয় সঙ্কটে মধুসূদন স্মরণে, 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ-হিতায় চ, জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।'—মহামন্ত্রধ্যানে রোরুদ্যমানে স্বীয় সাধনের ধন সত্যসনাতনের শরণাপন্ন হইতেছিলেন, তুমি দেব দিনপতে, সানন্দে সন্ধ্যা-সম্মিলনে অবাধে অস্তাচলে চলিয়া গেলে! চাহিয়াও দেখিলে না, মুমূর্ষু অসহায় শিশু মরিল কি বাঁচিল!

যে দিন ত্রেতায় ত্রিলোক-নাথ রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া, দুর্যাপ্য রাজব্রত উদ্‌যাপনে, স্বকীয় সুখাভিলাষ সমুৎসর্গে, স্বপ্রাণ-প্রতিমা পাবকপবিত্রা সতীসাবিত্রী স্বয়ংলক্ষ্মী সীতাদেবীকে অরণ্যে বিসর্জ্জন করিলেন, ভীষণ গহনে শ্বাপদ-নাদ-ভীষিতা অসূর্য্যম্পশ্যা অশরণা অবলা দিনশেষ দর্শনে দ্বিগুণত্রাসে মুহ্যমানা, আকুলে আর্ত্তনাদ-পরায়ণা, সে দিনেও দিনমণে, তুমি দীনার রোদনে বধির হইয়া আপন বিমানে আপন অভিমানেই

অস্তগিরি আরোহণ করিলে! অবলার দশা তিলেক দাঁড়াইয়াও দেখিলে না!

আবার দ্বাপরে, ওই দেখ, দেবদত্ত-শঙ্খনাদে সুরাসুর শঙ্কিত! ত্রিভুবন কম্পিত!—পুত্রশোকার্ত্ত পার্থ-ধনুর্দ্ধর পুত্রহা জয়দ্রথের প্রাণনাশার্থ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন! প্রভাকর, তোমার অস্তকালযাবৎ প্রতিজ্ঞাপূরণ না হইলে প্রজ্বলিত হুতাশন-শিখায় স্বদেহ সহ সকল শোকজ্বালা বিলীন করিবেন! স্বয়ং মধুসূদনও এ বিপত্তিতে ব্যতিব্যস্ত,—সারথি হইয়া সমন্তাৎ শত্রু-অন্বেষণে ঊর্দ্ধশ্বাসে রথসঞ্চালন করিতেছেন; তুমি কিন্তু, গ্রহরাজ, সাগ্রহে সমানে স্বপথে স্বীয় রথ চালাইয়া দিলে, ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিয়াও একবার এ বিষম সমস্যার সমাধান করিতে সচেষ্ট হইলে না!

আজিও, এ কলিযুগেও দেখি, তোমার সেই একই চরিত্র! উপবাসী পূর্ণচন্দ্র, উপবাসী সারাদিন নিরীহ নিরপরাধ নির্ব্বোধ নিপীড়িত ব্রাহ্মণ-তনয়, উপবাসী পতিসহ পতিপ্রাণা সতী সাধ্বী ছোটবধূ; তুমি দেব, একবার দাঁড়াইয়াও দেখিলে না! সংসারের সকলকেই সুভুক্ত সুতৃপ্ত দেখিয়া, সকলকেই সানন্দ স্বচ্ছন্দ রাখিয়া, বিশাল বিশ্বের একপার্শ্বে মাত্র এই অসহায় অনুপায় দীনহীন জনত্রয়কে অনাহারী অবজ্ঞাত অবধীরিত ফেলিয়া, দিনপতে, তুমিও অবাধে আপন পথে চলিয়া গেলে!

বুঝিলাম, বুঝিলাম, তুমিও অধীন, তুমিও আজ্ঞাবহ। অথবা, তুমিও বুঝি আজ ইঁহাদের সৌভাগ্য-প্রণোদিত হইয়াই সেই নৈশ

শুভযোগ আনয়নার্থ সোৎসাহে সত্বর প্রস্থান করিলে! তবে যাও দিনদেব, দেখি আমরা, তোমার পুনরুদয়যাবৎ এই 'হতভাগ্য ' সধবা, 'হতভাগ্য' পুঁয়ে এবং 'অভাগিনী' ছোট বধূর কি ভাগ্যোদয় হয়!

ক্রমশঃ অমানিশার অন্ধকারে মেহার অদৃশ্য। গৃহস্থালয়ে সায়ংকৃত্য—গোসেবা, বিগ্রহ-সেবা, সন্ধ্যাবন্দনাদি সকলই সমাহিত হইল; ক্রমে নৈশ ভোজনও সম্পন্ন। দিনশ্রান্ত পরিক্লান্ত পল্লী তখন শর্ব্বরীর শান্তিময় ক্রোড়ে নিঃশব্দে নিদ্রাগত।

ভট্টাচার্য্যালয় হইতে দুইটী নির্ব্বাক্ নৃমূর্ত্তি বহির্গত হইয়া সত্বর সতর্ক পদসঞ্চারে ক্রমশঃ শ্মশানাভিমুখে অগ্রসর,—অগ্রে পূর্ণচন্দ্র, পশ্চাতে ছোট্ ঠাকুর। উভয় মূর্ত্তিই ধীর, গম্ভীর; উভয়ই যেন জগজ্জিগীষু মহাতেজাঃ মহাবীর!

হে যশোর-গৌরব সূরি মধুসূদন! তোমার সেই মেঘনাদ-বধোদ্যত দিব্যায়ুধ-সংবলিত নিকুম্ভিলা-যজ্ঞাগার-যাত্রী 'সৌমিত্রি কেশরী' ও তৎসহ 'বিভীষণ বিভীষণ' আর আমাদের এই মহাব্রতের মহোদ্‌যাপনে মেহারে মহানিশার মহান্ধকারে ভূত-বেতাল-বিলাসভূমি ভয়ঙ্কর শ্মশানক্ষেত্র-যাত্রী সাধকদ্বয়, এই উভয় যুগ্মের কোন্‌টি অধিকতর তেজঃসম্পন্ন, অধিকতর দৈববলে বলীয়ান্, কোন্‌টির ভাব ভাবুকের অধিকতর ভাবোদ্দীপক, হে মহাভাবুক-চূড়ামণে,—গৌড়-নিকুঞ্জ-মধুচক্রিন্ মাইকেল মধুসূদন, সে বিচারে আমরা অক্ষম; তুমিই তাহা বুঝিলে বুঝিতে পারিতে, বুঝাইলে বুঝিতে পারিতাম।

ক্রমশঃ উভয়ে শ্মশানে সমুপস্থিত। দেখিলে এখন কে বলিবে যে, এই আমাদের সেই 'পুঁয়ে দাদা', বা ওই আমাদের সেই 'সব্বা'? শ্মশানক্ষেত্রে শূর-সাধকদ্বয় যেন আজ কুরুক্ষেত্রে ভীমার্জ্জুন!

'সব্বা রে, আর দেরি করা নয়। কোথা পাবি আর এত রাত্তিরে শব? আমিই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ি, তুই আমার পিঠের উপরে মজ্‌বুৎ হয়ে বসে সেই মন্ত্র—মনে আছে ত? সেই মন্ত্র—জপ কর্ত্তে থাক্‌,—বলিয়া পূর্ণচন্দ্র ছোট্‌ ঠাকুরের হস্ত দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া গম্ভীরে পুনরায় কহিতে লাগিলেন,—'ছাখ্‌ সব্বা, এইবার যা বলি, সে কথাগুলি বেশ্‌ মনে রাখ্‌বি, নইলে মর্‌বি।'

সব্বা।—কি দাদা? বল, ঠিক মনে রাখ্‌বো।

পুঁয়ে।—জপে বসে আর কিছুতেই উঠ্‌বি না, কথাও কইবি না, অন্য দিকে তাকাবিও না। যদি সেই সন্ন্যাসী ঠাকুর এসেও উঠ্‌তে বলেন, তাও উঠ্‌বি না, বা কথাও কইবি না।

স।—না দাদা, কিছুতেই না।

পুঁ।—আমি নড়্‌লে চড়্‌লেও তুই উঠ্‌বি না, বা আমাকে ডাক্‌বি না, খুব মজবুৎ হয়ে বসে কেবল জপ কর্‌বি, একটুও যেন কামাই দিস্‌ না।

স।—হাঁ দাদা, ঠিক্‌ তাই কোর্‌বো। যত বেলা মা না আস্‌বে, তত বেলা বেহ্মা বিষ্টু শিব এলেও উঠ্‌বোও না, কথাও কইবো না।

পুঁ।—আর দ্যাখ্, সবই ত তোকে বলে রেখেছি,—কিছুতেই ভয় পাবি না। শেষে, যখন মা এসে তোকে জিজ্ঞাসা কোরবেন,—কেন ডাক্‌চিস্, কি চাস্? তখন বল্‌বি,—আমি কিছু জানি না, এই পুঁয়ে দাদা জানে, এর কাছে শোনো।

স।—হাঁ দাদা ঠিক্ তাই বোলবো।

পুঁ।—তবে, সব ঠিক্?

স।—ঠিক্।

পুঁ।—এই শ্মশানে আজ মর্‌বি সেও স্বীকার, তবুও মায়ের দর্শন না পেলে উঠ্‌বি না। ভয় হয়, বিপদ্ হয়, তবে সেই শ্রীগুরু সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাদপদ্ম স্মরণ করিস্, সব দূর হ'বে। আমি এই শুয়ে প'লাম। এখন তোর ভাল মন্দ তোর নিজের কাছে; আমায় আর ডাকিস্ না।

এতাবৎ কহিয়া পূর্ণচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সেই শ্মশানস্থ জিনবৃক্ষমূলে অধোমুখে শয়ন করিলেন। ছোট্‌ঠাকুরও অমনি তাঁহার পৃষ্ঠ-পীঠে পদ্মাসনে স্থিরাসীন হইয়া মন্ত্র জপে নিরত হইলেন।

পাঠক মহাশয়, এখন মেহারে যে স্থানে বটবৃক্ষমূলে মা-কালীর 'স্থান' দেখিতে পাইবেন, উহাই আমাদের সেই 'সব্বা পুঁয়ে'র সাধন-ক্ষেত্র,—পূর্ব্ববঙ্গের অপূর্ব্ব তীর্থ! ওই বৃক্ষই সেই অতীতের অভিজ্ঞানভূত ব্রহ্মময়ীর সান্নিধ্যপূত প্রাচীন জিনপাদপ। প্রবাহিণী এখন এখান হইতে বহুদূরে প্রবাহিতা। কালে সেই স্থান এই স্থানে পরিণত। হা রে কাল!

ষষ্ঠ সর্গ।

'হুড়্ মুড়্, দুদ্দুড়্। হুঁ উঁ উঁ!'—

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ!—'এইবার পেমা মরেছে, পেমাকে যমে ধরেছে'—ইত্যাদি ইত্যাদি নানামতে মুগ্ধবোধ সুপদ্ম পাণিনি প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে করিতে, অশেষবিদ্যা-বিশারদী রসনাগ্র-সরস্বতী সপ্তপল্লী-কল্লোলিনী সহসা সুপ্তোত্থিতা শ্রীমতী পেমার মা সত্বর গাত্রোত্থানে প্রবৃত্তা। আড়া মোড়া, নড়া চড়া, আশমোড়া, পাশমোড়া, ওঠা পড়া প্রভৃতি বহুপ্রকার ব্যায়ামের পর, মচ্ মচ্—চড়্চড়্—খড়্খড়্—মড়্ মড়্ ইত্যাদি অশেষ আর্ত্তনাদ-পরায়ণ সুজীর্ণ খঞ্জ-খট্টখানিকে পরিত্রাণপ্রদানে, স্বীয় কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধমণত্রয় মাত্র শীর্ণ শরীরটী লইয়া, ক্ষিপ্রকারিণী এতক্ষণে অবনীতলে অবতীর্ণা!

'ও পেমা, ও পোড়ার মুখো, কথা ক', কথা ক'! 'ও তোর মা তোর মাথা খেয়ে, কথা ক,' কথা ক'!'

আর 'কথা ক'! কওয়ার কথা নয়, তার আর কইবে কি? —পেমা একেবারে অবাক্!

বাস্তবিক প্রেমচন্দ্র তখন যদবস্থ, যেরূপ ব্যস্ত, যেরূপ ত্রস্ত, যে অসাধ্য-সাধনে দৃঢ়মনঃস্থ, তদবস্থায় বাগ্মিপ্রবর এড্মণ্ড্ বার্ক্ বা মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও বাঙ্নিঃসরণ হওয়া সুকঠিন। পেমার মা অনর্থক চেঁচাইলে কি হইবে? পেমার বাঙ্নিঃসরণপথ তখন একেবারে একপোয়া পরিমিত ক্ষীরসরে পরিরুদ্ধ! কথা কহিবে কে?

ঘর অন্ধকারময়, সেই অন্ধকারের মধ্যে, এই অর্দ্ধরাত্রে উঠিয়া, মেঝের মাঝখানে দাঁড়াইয়া পেমা এই 'ননীচোরা নীলমণি'র কর্ম্মে নিবিষ্ট; প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, যায় প্রাণ, থাকে প্রাণ, একই গ্রাসে সমস্ত সর উদরস্থ করিবে, তাহাতে ভাগ্যে যাহাই ঘটুক্, তথাপি জল্লাদ-জননীর হস্তে বমাল গ্রেপ্তার হইবে না।

এদিকে উগ্রচণ্ডার মুহুর্মুহুঃ হুহুঙ্কার, আর অন্ধকারে ইতস্ততঃ খানাতল্লাসি। পেমা আর না থাকিতে পারিয়া, অগত্যা উদ্ভট ভাষায় উত্তর করিল,—

'এঁই এঁ আঁয়িঁ'=এই যে আমি।

তর্জ্জনগর্জ্জনে অমনি প্রত্যুত্তর,—

'ও হতচ্ছরা, তুমি কোন্ চুলোয় গিয়ে মরেছ? সরখানির দফা বুঝি সেরেছ?'

নেপথ্যে পুনরায় সেই প্রেতভাষায় উত্তর হইল—'ওঁয়াঁয়ঁ অঁওঁ আঁয়েঁ, আঁয়িঁ অঁওঁ আঁয়িঁ ইঁ'=তোমার সর আছে, আমি সব খাইনি।

সহসা গৃহ আলোকিত! গৃহচূড়া তৃণশূন্য; সহসা সমুজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের রশ্মিপাতে গৃহাভ্যন্তর যেন সহস্র দীপে দীপ্তিময় হইয়া উঠিল!

ও পোড়া কপাল! শিকের সব হাঁড়ীকুড়ী ফেলে দিয়ে চূরমার করেছ! তাই ত বলি—হুড়্ মুড়্ দুদ্দুড়্ শব্দ হোলো কিসের? এই যে! ও পোড়ারমুখো! হাঁড়ী মাথায় পড়ে মাথাটা

কেটে গেছে! ও সব্বনেশে! তাই বুঝি, হুঁ উঁ উঁ ক'রে উঠেছিলি! তবুও গালের সর ফেল্‌তে পারিস্ নি! ভাগ্‌গিস্, গলায় বেধে মরিস্‌নি! (সরের ভাণ্ড দেখিয়া) ও মা আমার কি হবে! হা নিব্বংশের বেটা! সবটুকু সরের দফা সেরেছ! তোমায় যমে নেয় না? তোমার মরণ হয় না?'—ইত্যাদি বিবিধ প্রবন্ধে স্তবমালা পাঠ হইতে হইতে, ততক্ষণে শ্রীমান্ প্রেমচন্দ্রের স্বকর্ম্ম সমাধা! যাই কণ্ঠনালী হইতে সরাধঃসরণ, অমনি সুস্পষ্টে স্বরনিঃসরণ!—

'মা' আজ এত রাত্তিরে হঠাৎ কোথা হ'তে এত বড় চাঁদ উঠ্‌লো মা?'

চঞ্চলা কিঞ্চিৎ অচলা হইলেন। ধৈবত-নাদিনী এবার ধীর স্বরে সবিস্ময়ে কহিলেন,—

'তাইত রে পেমা! ওই যে, ঘরের মট্‌কা দিয়ে চাঁদ দেখা যাচ্চে! এতবড় পুন্নিমের চাঁদ—এত জেল্লা—এমন চমৎকার ত কখনো দেখিনি রে! ভাল, ভচ্চাজ্জি বাড়ীর বট্‌ঠাকুর না বলেছিল, আজ আমাবস্যে!—হ্যাত্তরি, বাওন পণ্ডিতের পাঁজি পুঁথীর—'

অতঃপর পঞ্জিকাকার ও পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্দেশে যৎকিঞ্চিদ্ বাচনিক দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক প্রেমের গর্ভধারণী স্বয়ং পূর্ণিমা অমাবস্যার বিরোধ-ভঞ্জনকল্পে দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বহির্গতা হইলেন। প্রেমচন্দ্রের মহারিষ্টি কাটিয়া গেল।

সপ্তম সর্গ।

নিশীথ-সুপ্ত মেহার নীরব নিঃস্পন্দ। কেবল রহিয়া রহিয়া দাসরাজালয়ে প্রহরীর বিহগরাগ-সমুদীরিত স্বরতান সেই নীরবতার অবিচ্ছেদে অনুদ্বেগে উত্থিত হইয়া, আবার অবিচ্ছেদে অনুদ্বেগে তাহাতেই যেন নিলীন হইয়া যাইতেছে। সে তানে, সে সুমধুর স্বরহিল্লোলে শান্তি-সুকুমারীকে অশান্ত না করিয়া, বরং যেন সমধিক সান্ত্বনা প্রদান করিতেছে। রাজভবন এখন শান্তিসুখময়ী নিদ্রাদেবীর রাজত্বাধীন।

দাসরাজ অন্তঃপুরে পালঙ্ক-শয্যায় সুষুপ্তাবস্থায় সহসা শুনিলেন,—

'ত্যাখ্, বাহির হইয়া ত্যাখ্!'

মেহারপতি আকস্মিক সম্বোধনে সম্প্রবুদ্ধ হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক দ্বারোন্মোচনে বহিরাগত। চতুর্দ্দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না, আর কিছু শুনিতেও পাইলেন না।

'কই, কিছুই ত না! কে কাহাকে কি দেখিতে কহিল? আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম? সব ত যেমন তেমনই আছে, নূতন ত কিছুই নাই! চন্দ্রালোকে ত চারিদিক্ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। তাই ত! চন্দ্রালোক! আজ না অমাবস্যা! কিরূপ হইল!'—এবং-সমস্যা-কুল দাসভূপতি পুনর্ব্বার গৃহপ্রবেশ করিলেন। গ্রন্থকোষ হইতে হস্তলিখিত পঞ্জী লইয়া, স্বর্ণাধারস্থ চতুষ্প্রহর-দীপী দীপা-

লোকে পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন,—সত্য অমাবস্যাই ত বটে! কিরূপ হইল! তবে কি আমার চক্ষুর ভ্রম?'—ইতি-চিন্তাকুল-চিত্তে আবার বহির্গমন। আবারও দেখিলেন, সুবিমল শশাঙ্ক-কিরণে দিঙ্‌মণ্ডল সুধাস্নপিত। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন,—'আহা কি সুন্দর! পূর্ণ সুধাকরে আজ কতই সুধা, কতই মাধুরী!—এ যে এক চাঁদে শত চাঁদের শোভা! এ চাঁদ কোথা হইতে আসিল!—ভাল, ছোট্‌ঠাকুর না বলেছিলেন—আজ পূর্ণিমা! তবে কি তাঁহারই কথা সত্য হইল!'—নৃপতির আর নিদ্রা হইল না।

অষ্টম সর্গ।

'ওরে, আর যেন রাত নাই। চারটা খেজুর-পাতা নে আয় ত পেমা, যে সরটুকু আছে বেঁটে মাখন তুলে রাখি; নইলে, তুই ও টুকুও কোন্ ফাঁকে গপ্‌পায় দিয়ে ফেল্‌বি; শেষে আমি ছোট্‌ঠাকুরকে মাখন দেবো'খন্ কোথা থেকে?'—বলিতে বলিতে পল্লীবাসিনী পূর্ব্বপ্রশংসিতা পেমার মা গৃহকোণ হইতে সরের ভাণ্ডটী, এবং শিল-নোড়া না পাওয়ায়, অগত্যা বেলন-পাটা আনিয়া, বারান্দায় সর বাঁটিতে বসিলেন।

জ্যোৎস্না-প্রভাবে দিবাকারা বিভাবরী। প্রেমচন্দ্র ইতস্ততঃ অন্বেষণে খেজুর-পাতা পাইল না। মাতা বলিলেন,—'যাক্, না পেলি পেলি, এই কলার পাতাতেই যেমন তেমন করে হবে এখন।'

ক্রমে সর বাঁটা হইল, রগ্‌ড়ান হইল; মাখন ভাল উঠিল না।

'ওরে, তবে যেন রাত আছে রে! জ্যোৎস্না দেখে আমার ভুল হয়েছিল।'—বলিয়া প্রেম-জননী দ্রব্যাদি গৃহে লইয়া পুনর্ব্বার সপুত্রে স্ব-পাটে খট্টাশায়িনী হইলেন।

ভাল, শিল-নোড়ার পরিবর্ত্তে বেলন-পাটায় বাঁটিলে, খেজুর-পাতার পরিবর্ত্তে কলার পাতায় রগ্‌ড়াইলে, এবং প্রভাত-কালের পরিবর্ত্তে রাত্রিবেলায় তুলিলে মাখন ভাল উঠে না কেন?—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কহিয়াছেন,—'ভোরের বেলায় মাখন ওঠে ভাল।'

বাস্তবিক কথাই ত! যে কার্য্যের যে সময় বা যে উপকরণ, তাহা ব্যতীত সে কার্য্যে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

দেশ-কাল-পাত্রাদির তবে কি এতই মাহাত্ম্য!

ক্ষীরসরে নবনীত বিদ্যমান, জীবেও স্বরূপ-চৈতন্য বর্ত্তমান। মর্দ্দনে নবনীতের উৎপত্তি, সাধনে চৈতন্যের স্ফূর্ত্তি। কিন্তু, সেই মর্দ্দনবৎ এই সাধনও কাল-দেশ-পাত্র-সাপেক্ষ। তবে, কর্ম্ম কখনও এককালেই নিস্ফল হয় না। কিন্তু ভোরের বেলায় সর শিলে বাঁটিয়া খেজুর-পাতা দিয়া রগ্‌ড়াইয়া না তুলিলে, মাখন ভাল উঠে না।

হিমাচল-চূড়াধিরোহণে সহস্র বর্ষ ধ্যান-ধারণা-সমাধি সাধনেও যে সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য, দেশ-কাল-পাত্র-মাহাত্ম্যে কখন কখন তাহা একদিনেই সুসাধ্য,—ইহা শিববাক্য।

তুমি ভাই বড় ডাক্তার, ষোল টাকা তোমার ভিজিট; তুমি ভাই বিজ্ঞানবিশারদ, ইংলণ্ড আমেরিকার বিজ্ঞান-বারিধি মন্থন করিয়া, সাররত্নরাজি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ; তোমরা উভয়েই বিধাতার সৃষ্টিটা খণ্ড খণ্ড করিয়া আবার যোড়া লাগাইতে পার। আচ্ছা, এক খণ্ড মাংস, এক ফোটা দুধ, এ সকল দ্রব্যে কি কি উপাদান কি কি পরিমাণে আছে, তাহা ত ভাই তোমরা জানিয়াছ, দেখিয়াছ, দেখাইতেও পার; ভাল, একখণ্ড মাংস, এক ফোটা দুধ প্রস্তুত করিয়া দেও দেখি। তাহা পার না। কেন পার না?

সবই ত জান! না, এক বিষয় জান না। সে বিষয় কি? না, কাল-দেশ-পাত্র-যোগ। ঐ যোগের শক্তি তোমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সম্পূর্ণ অনায়ত্ত।

পতিত শ্রাদ্ধ অমাবস্যা বা কৃষ্ণৈকাদশীতে করিবার ব্যবস্থা কেন? অমাবস্যা পূর্ণিমায় শরীরে অকস্মাৎ রসভর হয় কেন? সে রস কোথা হইতে কিরূপে সঞ্চারিত হয়? কোথাই বা আবার যায়? সে রস যথার্থই কি অপকারী? না, আমাদের অসিদ্ধ দেহ তাহার পর্য্যাপ্ত পাত্র নহে বলিয়াই অপকারী? পঞ্চ পর্ব্বের কি মাহাত্ম্য? দিনবিশেষে স্ত্রী তৈল মৎস্য মাংসাদি নিষিদ্ধ কেন? অষ্টমীতে নারিকেল-রস কিসে দোষাবিষ্ট? অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী, শিবচতুর্দ্দশী, জন্মাষ্টমী, মহাষ্টমী, ইত্যাদিতে উপবাস ব্যবস্থা কেন? উত্তরায়ণ দক্ষিণায়নের সহিত মানব-স্বভাবের কি সম্বন্ধসূত্র?—এ সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? যদি দেখিয়া থাক, তবে যতই বুঝিয়াছ, তদপেক্ষা আরও বুঝিবার অনেক বিষয় আছে। যত বিদ্যাধর হও, সাধন ব্যতীত মহাবিদ্যার বিষয় সকলই অবোধ্য!

উল্লিখিত প্রতি-তত্ত্বেই কালমাহাত্ম্য নিহিত। সোজা কথায়, সকালের কাজ আর বিকালের কাজে, দিনের পড়া আর রাত্রির পড়ায়, মাঘ মাসের পাকা আম আর জ্যৈষ্ঠ মাসের পাকা আমে কত তফাত বল দেখি।

এ সব মোটা কথায় কালমাহাত্ম্য মানিলে কি? তবে বলিবে,—যে পর্য্যন্ত বুঝা যায়, সে পর্য্যন্ত মানা যায়। কিন্তু

তোমার বুদ্ধির অতীতে যে তত্ত্ব নাই, সত্য নাই, এটাই কি সুবুদ্ধির কথা ?

তুমি বলিবে,—হাঁ, থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে যাহা বলিবে তাহাই মানিব না, অথবা—আরও স্পষ্ট কথায়—মুনিঋষিদের উদ্‌ভট্টি মত, ওসব মানিতে পারি না।—আরও সোজা কথায়—আমি এত জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়া, এখন আবার অজ্ঞানের ন্যায় গুরু-জ্ঞানে অন্ধবিশ্বাস কেন করিব ?

এইবার রোগের গোড়া ধরা পড়িয়াছে,—অজ্ঞান-সম্ভূত অহঙ্কার। এই অহঙ্কার বা অজ্ঞান-জনিত জ্ঞানাভিমান জ্ঞানেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বাগ্রে পরিহর্ত্তব্য। গুরুজ্ঞানই সর্ব্বজ্ঞানের অধিষ্ঠান।

মুসল্‌মান মক্কায় যান, খৃষ্টিয়ান্ জেরুজেলেমে যান, গির্জ্জায় যান, হিন্দুও তীর্থে যান, দেবালয়ে যান;—কেন ? বাড়ীতে বসিয়া কি ধর্ম্ম হয় না ? হয়; তবে, শিল-নোড়া নইলে বেলন-পাটায় মাখন ভাল উঠে না।

কোনও দিন কোনও শ্মশানে শবদাহন করিতে গিয়াছ কি ? মনটি তখন কেমন হইয়াছিল, দেখিয়াছ কি ? ঐ দেখ দেশ-কাল-দ্রব্যের কেমন মাহাত্ম্য ? আবার ঐ শ্মশানে অমাবস্যা বা কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দুই প্রহর রাত্রিতে একাকী গিয়াছ কি ?—যাও নাই। পরীক্ষাচ্ছলে যাইও না। ধর্ম্মবিষয়ের পরীক্ষা করা বড়ই অপকর্ম্ম। যীশুখ্রীষ্টও বলিয়াছেন,—'Thou shalt not tempt the Lord thy God.'—তোমার প্রভু পরমেশ্বরের পরীক্ষা করিও না।

একটি বড় আশ্চর্য্যের কথা! একবার,—সে অনেক দিনের কথা,—শ্রীশ্রী৺কাশীক্ষেত্রে, শুনি, একটা লোক, হিন্দুস্থানী,—সে রাস্তার ধারে একখানা খাটিয়ার উপর চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে; লোকটা অথচ নিদ্রিত নয়। আলস্য বশতঃই শুইয়া আছে। জন চারি পাঁচ যণ্ডামর্ক আসিয়া পারিহাসচ্ছলে সহসা খাটিয়াখানির চারি পায়া ধরিয়া কাঁধে তুলিয়া, উচ্চৈঃস্বরে 'রাম কহ, রাম কহ' কহিতে কহিতে মণিকর্ণিকায় লইয়া চলিল। খাটিয়াশায়ী লোকটাও রঙ্ করিয়া, মরার মত চুপ্ করিয়া পড়িয়া রহিল। লোক-কয়টা খাটিয়া-ঘাড়ে—'রাম কহ, রাম কহ' রবে এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া, এই রঙ্ তামাশা দেখাইয়া, যখন মণিকর্ণিকার মহাশ্মশানে গিয়া খাটিয়া নামাইল, তখন দেখে,—কি সর্ব্বনাশ!—লোকটা যথার্থই পঞ্চত্ব পাইয়াছে! হায় হায়! তবে কি দেশ-কাল-পাত্র-শব্দাদি-সংযোগের এতই শক্তি!

আচ্ছা, এ সব না হয় কতক অংশে মানিলাম, কিন্তু আর একটা কথা আছে। সেটা বড় মজার কথা! কথাটা কি,—এই বীজ-মন্ত্র। এটার ত মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝি না। এই যে বসে বসে 'পিড়িং পুড়ুং চিড়িং চুড়ুং' করে, এ ছাই ভস্মের মানে বা কি, আর এতেই বা ভগবানের উপাসনা কি করে হয়, তা'ত কিছু বুঝ্তে পারি না। এ অনর্থক একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করার ফল কি? মিছেমিছি এ কর্ম্মভোগ কেন?—

যশোর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার স্কুলগৃহে একবার একটা সভা হইতেছিল। এক পাদ্‌রী সাহেব আসিয়া সমস্ত হিন্দু ভদ্রলোকদিগকে আহ্বান করিয়া সভাস্থলে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারচ্ছলে হিন্দুধর্ম্মের 'কুষ্ঠী' গাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। এ বড় বেশী দিনের কথা নয়। কোঁড়কৃদি-নিবাসী বিখ্যাত নৈয়া-য়িক ৺রামধন তর্কপঞ্চানন মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। একটী মোকদ্দমা উপলক্ষ্যে পঞ্চানন ঠাকুর সে দিন মাগুরায় উপস্থিত এবং সভায় সমাসীন। পাদ্‌রী সাহেব অবশেষে হিন্দুর বীজমন্ত্র সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ টীকাটিপ্পনী করায়, রামধন আর থাকিতে পারিলেন না। তর্কপঞ্চানন যেমনই সুবিদ্বান্, তেমনই সুরসিক। উঠিয়া বলিলেন,—'সাহেব, আপনি কি একটু আধ্‌টু সংস্কৃত পড়িয়াছেন ?'

সাহেব।—(হাসিতে হাসিতে) হাঁ, টোমার শাষ্ট্র কিছু কিছু হামি পড়িয়াছে, ভাল পড়িটে পারে না।

রামধন।—বলুন্ ত, কুকুরের কি কি সংজ্ঞা ?

সাহেব।—কুক্কুর্, শ্বন্, সারমেয় ; আরও আছে, হামি ভুলিয়া গিয়াছে।

রামধন।—আচ্ছা, হুজুর, ওই দেখুন্, বটতলায় একটা কুকুর শুইয়া আছে। আপনি কুকুরের যত নাম জানেন, এক একটি বলিয়া কুকুরটিকে ডাকুন্ ত।

সাহেব।—কেন পণ্ডিট্ ? কুকুর ডাকিয়া, টুমি হামাকে কামড়াইবে না কি ? ডাকিটে হয়, টুমি ডাক।

রামধন।—আচ্ছা, আমিই ডাকিতেছি। (উচ্চৈঃস্বরে কুকুরের উদ্দেশে) ওরে কুকুর! ওহে কুক্কুর! হে শ্বন্! হে সারমেয়! একবার এস বাপু! (সাহেবের প্রতি) কই সাহেব, কুকুর ত এল না! এত ডাক্‌লাম, তাকালেও না ত! এখন দেখুন, আমার বীজমন্ত্রের কি গুণ! (উচ্চৈঃস্বরে) তু-তু! তু!

দূরে বটবৃক্ষমূলে শয়িত সুপ্ত সারমেয়-পুঙ্গব নিদ্রাত্যাগে অমনি আহ্লাদে অষ্টধা হইয়া ল্যাজ লাড়িতে লাড়িতে সভা-শোভনে সমাগত!

পঞ্চানন মহাশয় পার্শ্ববর্ত্তী দোকান হইতে এক পয়সার মুড়্‌কি কিনিয়া আনাইয়া, কুকুরটীর সম্মুখে দিলেন। কুকুর মহাহ্লাদে মুড়্‌কি খাইতে লাগিল। 'পণ্ডিট্ কুকুরকে নিমণ্টন্ করিয়া ফলাড়্ খাইটেছে'—বলিয়া সাহেব হাসিয়া বেএক্তার!

হায় হায়, কোথায় আজ সে সব সরল-প্রাণ সহৃদয় সাহেব, কোথায়ই বা আজ সে সব সুরসিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি তত্ত্বনির্ণায়ক!

তবে কি বীজ ভিন্ন নামজপে সাধন হয় না?—হয় বৈ কি! তবে কলার পাতা চাইতে খেজুর-পাতা দিয়া রগ্‌ড়াইলে মাখন উঠে ভাল। সর্ব্বসাধারণতঃ, এ যুগে নামজপই সহজ পন্থা। নাম ও বীজ একই কথা; তবে, সাধন ও সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে একটু—তারতম্য নহে,—প্রকারভেদ মাত্র আছে। নামজপ যত উচ্চৈঃস্বরে, ততই ভাল; বীজজপ যত নীরবে, ততই ভাল। উপাংশু জপ, মানস জপ, ওষ্ঠ জিহ্বা স্বর বা শ্বাসের সাহায্য ব্যতীত জপ, পর পর ক্রমেই ভাল। দমে দমে জপ, সেও খুব

ভাল ; বেদম জপ আরও ভাল ; কিন্তু জবরদস্তির বেদম, সে মাত্র আসুরিক পশুশ্রম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরম ভক্ত মহাত্মা হরিদাস ঠাকুরের উচ্চৈঃস্বরে নাম জপ, খোদার প্রিয়তম দোস্ত্ আরব্যাবতার হজরৎ মুহম্মদের শতোষ্ট্র-নাদ-সদৃশ গগনভেদী ধ্বনিতে নামজপ, শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীবাস-অঙ্গনে খোল-করতাল-বাদ্যে প্রচণ্ড তাণ্ডবনৃত্যে সারারাত্রি রোরুদ্যমানে 'হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণযাদবায় নমঃ' ইত্যাদি শব্দে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অপূর্ব্ব অলৌকিক জপ, এ সকলের আর তুলনা নাই!

তবে, ধ্বনিমাত্রের মাহাত্ম্য কি এতই গুরুতর! শব্দশক্তি কি এরূপই মহাশক্তি!—অসম্ভব কিসে?—

'একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ স্বর্গে লোকে চ কামধুগ্-ভবতীতি শ্রুতিঃ' = একটী মাত্র শব্দ সুপ্রযুক্ত এবং সম্যক্ জ্ঞাত হইলে, উহা স্বর্গে তথা সর্ব্বলোকে কামপ্রদ হইয়া থাকে,—ইহা বেদবাক্য।

তথা চ ঋষিবাক্যে,—"আদৌ নাদস্ততো বেদঃ,"—ইত্যাদি নানামতে নানাশাস্ত্র-মুখে শব্দমাহাত্ম্য ইঙ্গিতে উদ্দিষ্ট। কেন?—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ ; তন্মধ্যে শব্দ-সংকীর্ত্তন এত কেন?

বাস্তবিক, বস্তুবিচারেও ব্যোম ভূতশ্রেষ্ঠ। মাটি বড় মোটা ; জল তদপেক্ষা একটু সূক্ষ্ম ; নয় কি? আবার, আরও সূক্ষ্ম তেজ, তা' চাইতেও সূক্ষ্ম মরুৎ (স্থিরবায়ু), সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্ম ব্যোম বা শূন্য,—অস্তি নাস্তি ন জানামি। সাদা যদি বর্ণাভাব,

ব্যোম তবে ভূতাভাব বলিলেও চলে; অথচ এই ব্যোম সর্ব্বভূতাধার। এবংবিধ বস্তুবিচারে যদি ব্যোমই শ্রেষ্ঠ, গুণবিচারে তবে শব্দই শ্রেষ্ঠ; যে হেতু, পঞ্চভূতের পঞ্চগুণ, তন্মধ্যে ভূতশ্রেষ্ঠ ব্যোমগুণই শব্দ। আবার গন্ধ—রস—রূপ—স্পর্শ—শব্দ,—পরাৎপর বিচারেও ভূতমধ্যে ব্যোমবৎ, গুণমধ্যে শব্দই সূক্ষ্ম বা প্রধান প্রতিপন্ন হইবে;—তবে সে বিচারটাও একটু সূক্ষ্ম, স্থিরবুদ্ধিসাধ্য। এ'মতে, ভূতবিচারে যদি আদৌ ব্যোম, তবে তদ্বৎ, গুণবিচারে "আদৌ শব্দঃ"="আদৌ নাদঃ।" কিন্তু নাদ ও শব্দ কি এক?

হাঁ, অন্ততঃ উপস্থিত প্রস্তাবে একার্থপ্রতিপাদক বলিয়াই পরিগৃহীত। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝি, বস্তুদ্বয়ের সংঘাতপ্রতিঘাতই শব্দের উৎপত্তিহেতু। গুরুগণ কহেন,—শুধু তাহা নহে, অনাঘাতেও শব্দ বা নাদ স্বয়ম্ভূ। এইরূপ অনপেক্ষ আদিম শব্দকেই অনাহতধ্বনি কহে। ইহার জ্ঞান কিংবা আকর্ণন সাধারণতঃ অসম্ভব,—মাত্র সাধনসাপেক্ষ এবং সে সাধন গুরুসাপেক্ষ। অতএব ইহার অতোঽধিক ব্যাখ্যান অসঙ্গত, অনর্থক।

অতঃপর, ঘাতোদ্ভূত শব্দ ইহা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—অস্ফুট (inarticulate) এবং স্ফুট (articulate)। স্বয়ম্ভূ শব্দের ত কথাই নাই, ঘাতোদ্ভূত স্ফুটাস্ফুট-শব্দের শক্তিও অসীম, অনালোচ্য।

নরকণ্ঠই স্ফুট শব্দের সাধারণ সুপ্রকাশ-যন্ত্র; এবং ঋষিগণ এই শ্রেণীর শব্দের আদিম উপাদান আবিষ্কারপূর্ব্বক উহা-

দিগকে অক্ষর নামে অভিহিত করিয়াছেন। আবার, এই অক্ষর-সমূহেরও সাধারণ সারাংশ 'অ'কার বলিয়া স্থিরীকৃত ; তথা হি গীতায়াম্—'অক্ষরাণামকারোঽস্মি'। অকার হইতে কিরূপে সর্ব্বাক্ষরের উৎপত্তি,স্বরব্যঞ্জনের স্বাতন্ত্র্য, বর্গ-ব্যবচ্ছেদ, অক্ষরের প্রকৃত প্রতিরূপ ও পারম্পর্য্যবিধান,দেবাক্ষর-মালার মৌলিকতা, অর্থ, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতি বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞানও সাধন-সাপেক্ষ, উহার মাত্র পরোক্ষাভাস গ্রন্থাদিতে প্রকাশিত। এই সকল তত্ত্বের সহিত শব্দশক্তির সবিশেষ সম্পর্ক থাকিলেও ইহা-দের আলোচনা এস্থলে অনুদ্দেশ্য, অসম্পোষ্য।

অক্ষর-বিরচিত শব্দসমূহের শক্তি-সমালোচনা করিতে গেলে, প্রথম ও প্রধান প্রশ্ন,—এই শক্তির হেতু কি?—ঘাতোদ্ভূত তরঙ্গ, প্রাক্তন সংস্কার, না শব্দাত্মনিহিত কোন গূঢ়তত্ত্ব? 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিলে, তৎফলে উচ্চারক বা শ্রাবকের অন্তরি-ন্দ্রিয়ে তথা দেহযন্ত্রে এবং বাতব্যোমে (air & ether) সর্ব্বত্রই যে একটা স্পন্দ বা প্রকম্প (vibration) উদ্ভূত হয়, তাহা বোধ হয় স্বল্পায়াসেই সকলেরই অনুমেয়। ইহাকেই কহিতেছি ঘাতোদ্ভূত তরঙ্গ।

মনে মনে নিশীথ-নিবাত-নিস্তব্ধ প্রশান্ত মহাসাগরের রূপ কল্পনা করুন্ ; ওই,—যেন অনাদি-অনন্ত-অসীম অস্পন্দ অখণ্ড বারিব্রহ্মাণ্ড ধীর-বিরাজমান! পুনরায়, উহাতে কল্পনা-করে টুপ করিয়া একটী বদর-প্রমাণ লোষ্ট্র নিক্ষেপ করুন। ওই—ওই দেখুন, লোষ্ট্রপাতমাত্রেই অবিচ্ছিন্ন বারিরাশি আদৌ ঐ স্থানে

অবচ্ছিন্ন হইয়া লোষ্ট্রটীকে প্রবেশাধিকার প্রদান করিল; ওই —ওই—ওই দেখুন, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই চক্রাকারে চতুর্দ্দিকে স্পন্দ, প্রকম্প বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ উত্থিত হইল! ওই দেখুন, একের বিলয়ে অপরের উৎপত্তি—ইত্যাদিক্রমে তরঙ্গচক্রাবলী ক্রমশঃ ক্ষীণ অথচ দূর-প্রসারিত হইতে লাগিল! এখন বলুন্ দেখি,—কত দূরে কোথায় উহাদের একান্ত বিলয়?—চক্ষুর অগোচর হইলেও, একেবারে বোধ হয় মনের অগোচর নহে। ক্ষীণাৎ ক্ষীণ—অণুক্ষীণ হইয়া গেলেও, যাবৎ সাগর তাবৎ ঐ সকল তরঙ্গ বা হিল্লোলের সম্প্রসার;—অনুমান হয় না কি? ভাল, তা'র পর? তার পরেই কি একান্ত বিলয়?—সন্দেহ।

বিশ্বসাগরেও সেইরূপ শব্দের তরঙ্গ। এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড স্থির-ধীর-বিরাজমান। ইহাতে টুপ্ টাপ্; দুম্ দাম্, ঠুং ঠাং যেখানে যে শব্দটী হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি—কেবল বায়ুসাগরে বা ব্যোমসাগরে নহে, সমগ্র বিশ্বসাগরে অমনি সঙ্গে সঙ্গে—এক একটী তরঙ্গোদয়, আর অসীমবিশ্বসীমায় উহাদের ক্রমবিলয়;—যদি বিলয় সম্ভবে। ওঃ! শব্দশক্তি তবে কি মহাশক্তি!—মহীয়সী, অপার, অসীম, কল্পনাতীত! আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচরপরিব্যাপী বলিলেও,—অত্যুক্তি দূর আস্তাং—বোধ হয় পর্য্যাপ্ত উক্তি হয় না।

এতাবৎ বুঝিলাম বটে,—ঘাতোদ্ভূত তরঙ্গই শব্দশক্তির সঞ্চার ও সম্প্রসারের হেতু। অর্থাৎ, 'মা'—শব্দটী উচ্চারণ করিলে, তাহা যে অদূর বা সুদূরবর্ত্তিনী—বাতব্যোমাভ্যন্তরে অথবা

বাতব্যোমপারে—অত্রস্থ বা তত্রস্থ মায়ের কর্ণগোচর বা জ্ঞান-গোচর হইবে, ঘাতোদ্‌ভূত তরঙ্গাবলী তৎপ্রতি প্রধান হেতু বটে। কিন্তু, 'অ'-কার—এই আদিস্বরোদয় মাত্রে উহাকে বহির্গত হইতে না দিয়া, ওষ্ঠ-কবাট-রোধে ঐ স্বর নাসামূলে চালিত করিয়া, ঔষ্ঠ্যবর্গের (অনুনাসিক) পঞ্চমবর্ণ 'ম'-কাররূপে পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক, পুনর্ব্বার দীর্ঘ 'অ' অর্থাৎ 'আ' এই স্বরসংযোগে ওষ্ঠ-কবাট মুক্ত করিয়া বহিষ্কৃত করিলে, 'মা' শব্দ উচ্চারিত হইল। ঐ ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা তৎপূর্ব্বেই বা তৎপরেই ঐ 'মা' শব্দের দ্বারা অন্তরে যে বস্তুনির্দ্দেশ হইল, শব্দের ঐরূপ বস্তুনির্দ্দেশ-শক্তি কি অন্তর্ব্বহির্ঘাতোদ্‌ভূত তরঙ্গ-সঙ্গত, না প্রাক্তন সংস্কার-সঙ্গত, না শুদ্ধ শব্দাত্ম-সঙ্গত? অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চারণহেতুক শারীর যন্ত্রাদির তথা দেহান্ত-র্জড়িত বায়ুনাড়ীজালের ঘাত-প্রতিঘাতে, অথবা বাতব্যোম বা তদতীত কোন অপদার্থভূত পদার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে উক্ত শক্তির উদ্‌ভব?—না, 'মা' বলিতে ইহজন্মাবধি বা পূর্ব্বজন্মেও যে বস্তুজ্ঞান জন্মিয়াছে, সেই প্রাক্তন সংস্কারবশে ঐ শক্তির উৎপত্তি? কিংবা, 'মা'—এই অঙ্কন-অবলোকন-উচ্চারণ-আকর্ণন-বর্জ্জিত বিশুদ্ধ অনাহত শব্দস্বরূপই ঐ বস্তুর স্বরূপ?—এ বড় বিষম প্রশ্ন!

আমাদের অন্ধ আত্মম্ভরি বুদ্ধিকে তর্কতমোজালে জড়াইয়া ইতস্ততঃ অনিশ্চিত পথে ধাবিত করিয়া কৌতুক প্রদর্শন—এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং কল্পিত বিচারে বিরত থাকিয়া

তথা স্বদেশ বিদেশের আধুনিক পরোক্ষদার্শনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত প্রকাশ না করিয়া, প্রত্যক্ষদর্শী প্রাচীন গুরুগণের উপদেশ-শিরোধারণে স্বীকার করিব,—"আদৌ নাদঃ (শব্দ) ততো বেদঃ (জ্ঞান)," অর্থাৎ আমাদের বস্তুজ্ঞানের পূর্ব্বেও শব্দ স্বয়ম্ভূ ; শব্দাত্মায় বস্তুস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান ; সংস্কার বা ঘাতপ্রতিঘাত তাহার প্রকাশপক্ষে সহায়ক হেতু মাত্র। এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সেই বহুব্যাপক বহুজ্ঞাপক মহাবাক্যটীর মাহাত্ম্যও স্বীকার করিব,—At first it was word, and the word was with God. and the word was God"—"আদৌ শব্দঃ পরমপুরুষপ্রশ্রিতো বৈ স্বয়ং সঃ"।

"একঃ শব্দঃ সুপ্রযুক্তঃ সম্যক্ জ্ঞাতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতেও প্রথমতঃ শব্দ পরে সুপ্রয়োগ, তৎপশ্চাৎ সম্যক্ জ্ঞানের উল্লেখ। এ' মতে, শব্দ বীজ, প্রয়োগ বৃক্ষ, জ্ঞান সর্ব্বকামাত্মক সুরসাল মহাফল। এ জ্ঞান কিন্তু আভিধানিক জ্ঞান বা সাধারণ বস্তুজ্ঞান নহে। ইহাও তত্ত্ব (তৎ + ত্ব) জ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান।

এক্ষণে, আমরা ইহাও বলিতে পারি,—বীজ, নাম বা মন্ত্রাদির অর্থবোধ ব্যতীতও তাহার জপ বা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বিফল নহে ; যেহেতু, মাত্র জপ হইতেই শব্দশক্তিহেতুক অর্থবোধ ও সম্যক্ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। "জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধিঃ জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ"।

জয়দেব গোস্বামিকৃত পদাবলী পাঠ করিলে, বর্ণবোধবিহীন মহামূর্খেরও কেবল শ্রবণমাত্রেই মন মুগ্ধ হয়। কামরূপে কামাখ্যাপুরীতে 'হাড়ীর ঝি' রূপে আবির্ভূতা শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার আদিম অবিকৃত মন্ত্রাবলী এখন বিলুপ্তপ্রায়; দৈবাৎ এক আধ-টুকুও পাওয়া গেলে দেখা যায়, উহার অর্থসঙ্গতি কিছুই নাই; কিন্তু, হইলে কি হয়, শুধু শব্দশক্তিই অসীম। অজ্ঞতাবশতঃই আমাদের ইহাতে এখন অপ্রত্যয়। মুসলমান শাস্ত্রেও মারফতি মতে শব্দ-শক্তির সবিশেষ সমাদর। শ্রীশ্রীব্রহ্মহরিদাস ঠাকুর ওরফে 'যবন হরিদাস' এই শব্দসাধন বা নামজপরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞানুষ্ঠানে সর্ব্বজনপূজ্য! গীতাতে শ্রীভগবান্ এ সাধনের সাধুত্ব কীর্ত্তন করিয়া কহিয়াছেন,—"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽহম্।" শ্রীশ্রীনরোত্তম ঠাকুরও কহিয়াছেন,—"যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি। নামের সহিত ফেরে আপনি শ্রীহরি॥"

এই কলিযুগে, বহুবিধ কুবিচার-বুদ্ধিতে লোকচিত্ত সতত সমাকুল, দেহ-মনও সংযম-সাধনে অসহিষ্ণু, দেশ কাল সঙ্গেরও অসংমিলন, আবার বহুলোকই স্বভাবতঃ বাচালতাপ্রিয়; ইত্যাদি কারণে প্রার্থনা, জপ, সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতি প্রণালীতে, পরমার্থ সাধন বিষয়ে মহীয়সী শব্দশক্তির সমাশ্রয় অতীব শ্রেয়স্কর এবং সহজ পন্থা। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুও বারংবার বলিয়াছেন, —"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥"

কেবল নাম = রূপধ্যানাদি-বর্জ্জিত নামমাত্র।

নবম সর্গ।

এক রকম মরণ আছে, তাকে বলে 'জ্যান্তে মরা।' সে-কালের জাঁহাবাজ মেয়েগুলা সহমরণে যাইবার সময় কতকটা এই রকমের মরা মরিত। সাধ ক'রে হয় না; যার যখন হয়, তার তখন আপনিই হয়। সাধ ক'রে মরিতে, বা বাঁশ দিয়ে ঠেসে ধ'রে মারিতে আরম্ভ করিল বলিয়াই ত গভর্ণমেণ্ট (বা ভগবান্) সহমরণ-প্রথা রহিত করিলেন।

দুঃখ, শোক, অপমান, ঘৃণা, অভিমান, লজ্জা, বিস্ময়, আসক্তি ইত্যাদির আতিশয্য ঐরূপ মরণটার বড় সুন্দর অবসর। এই জন্যই, বোধ হয়, সাধু বলিয়াছেন,—'সুখ্‌মে, বাজ্‌ পঁড়ু, দুখ্‌কা বলিহারি যাই। ঐসে দুখ্‌ আয়ও যো ঘড়ি ঘড়ি হরি-নাম সোঁরাই॥' এই জন্যই শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুর বাইশটা বাজারে মার খাইয়া তখনও বলেন,—'উহুঁ, হয় নাই, আমাকে তোমরা আরও বাইশ বাজারে ফেলিয়া মার।' এই জন্যই বোধ করি, করুণাসাগর যীশু কহিয়াছেন,—"Blessed are they that weep; for, they shall be comforted. যাঁহারা বিলাপ করিতেছেন তাঁহারা ধন্য, কারণ, তাঁহারা সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইবেন।" সংসারে এই মরণই বাঁচনের পথ। এই মরণেই অমরত্ব বা শিবত্ব লাভ; এবং শিব ব্যতীত শক্তিপদাশ্রয়,

বা হর ব্যতীত হরিদর্শন অপরের ভাগ্যে অসম্ভব। তথাহি সনাতন প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু-বাক্য,—'জীবে না সম্ভবে, সনাতন'।

শ্মশান, শব, অমাবস্যা, দুই প্রহর রাত্রি, নির্জনতা, প্রিয়-জন-বিরহ, বহুজন-সম্মিলন, সঙ্গীত, খোল-করতাল-ধ্বনি, তাণ্ডব-নৃত্য, অনাহার, মনোহর বা বিস্ময়কর দৃশ্যদর্শন, নিঃস্পন্দাব-স্থান ইত্যাদির সহিত উক্তরূপ মরণ বা চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের নিকট সম্বন্ধ।

তুমি ভাই খৃষ্টিয়ান্, তুমি হয়ত বলিবে,—'না, ও সব সাকার উপাসনার পদ্ধতি; আমার নিরাকার ধ্যানে ওসব কথা মানি না। শ্মশানে গিয়া, উপবাস করিয়া বা নাচিয়া গাইয়া, হাসিয়া কাঁদিয়া, অথবা মেয়েমানুষ ফেয়েমানুষ লইয়া কাণ্ডকারখানা,—ওসব ভূতপ্রেতের উপাসনা,—উহার সহিত আমার স্বর্গস্থ পিতার কোন সম্পর্ক নাই।'—বলিয়া রাখি,—ঈশা কিন্তু চল্লিশ দিন উপবাস করিয়াছিলেন। আবার ওই দেখুন,—

সাহেবের বৈঠক্‌খানা সুসজ্জিত! সম্মুখস্থ টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছে। সাহেব যুবপুরুষ, চেয়ারে উপবিষ্ট। রাত্রি অনেক হইয়াছে, বাড়ীর সকলেই নিদ্রিত, পল্লী নীরব। ঘড়িতে একটা বাজিল; সাহেবের বিশ্বাস হইল না; চেয়ার হইতে উঠিয়া, বাতি লইয়া, দেয়ালের নিকট গিয়া, আলো ধরিয়া বেশ করিয়া ঘড়ি দেখিলেন,—হাঁ, একটাই বটে! তাহাতেও মনের সন্দেহ বা আবেগ মিটিল না। আবার আসিয়া চেয়ারে বসিয়া, পকেট হইতে ট্যাক্‌ঘড়িটা বাহির করিলেন; আলোর নিকট খুলিয়া

দেখিলেন,—এতেও ত একটা! বিরক্ত ভাবে সাহেব আর ঘড়ি পকেটে না রাখিয়া টেবিলের উপরেই ফেলিয়া রাখিলেন। ছড়ীগাছটী হাতে লইলেন; ইচ্ছা হইল, ভিত্তিলগ্ন বড় ঘড়িটার কাঁটা ছড়ীর ডগা দিয়া খানিক ঘুরাইয়া দেন; আবার, কি ভাবিয়া ছড়ীটা রাখিয়া দিলেন।—কি করা যায়? কিছুই ত আর ভাল লাগে না!—সম্মুখে টেবিলের উপর আলোর গোড়ায় একখানা বই পড়িয়া রহিয়াছে, পড়া দূর আস্তাং, কি বই তাহা দেখিবারও ফুর্‌সদ্‌ নাই। আবার ট্যাক্‌ঘড়িটা হাতে লইলেন, এবার একটা চারি মিনিট। ইচ্ছা হইল, ঘড়িটা আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলেন; আবার, কি ভাবিয়া, টেবিলের উপরেই ফেলিয়া রাখিলেন।

সাহেবকে কি রোগে ধরিল?—এ বড় শক্ত রোগ,—যে ছেলের হয়, সে ছেলের আর বাঁচা দায়। রাত্রি দেড়টার সময় লগ্ন স্থির, এখন সবে একটা চারি মিনিট! পূর্ব্বে গেলে প্রণয়িনীর দর্শনলাভ দুর্ঘট, পরন্তু বিপদ্‌ ঘটিতে পারে; ঠিক্‌ একটা ত্রিশ মিনিটে শুভ লগ্ন। সাহেব অভিসার-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া সন্ধ্যা হইতে এই রাত্রি একটা পর্য্যন্ত প্রণয়িনী-চিন্তায় আকুল হইয়া, আর এখন পারিয়া উঠেন না; উৎকণ্ঠার পর অবসাদ আসিয়া উপস্থিত। যেন কতকটা হতাশভাবেই কেদারা হেলান দিয়া পড়িয়া রহিলেন;—রাত্রি ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, জগৎ জনশূন্য, মন একেবারে অবসন্ন।

সহসা দীপাধারমূলস্থ পুস্তকোপরি একখানি পূর্ণচন্দ্রোদয়!

সাহেব নীরব নিঃস্পন্দ, অনিমেষ-নেত্র,—ঠিক্ যেন জ্যান্তে মরা! ক্রমে ঐ পূর্ণচন্দ্রমধ্যে প্রকাশিত—সেই মূর্ত্তি! কোন্ মূর্ত্তি?—তাঁহার অভীষ্ট দেবী সেই প্রণয়িনীর? না, তা নয়। সেই ক্রুস্‌দণ্ড, তদুপরি প্রলম্বিত সেই পতিতপাবন মূর্ত্তি! ভাই খৃষ্টিয়ান্, মাপ করিও, তুমি আমার সাকার মান বা না মান, আমি কিন্তু তোমার সবই মানি;—সেই পতিতপাবন মূর্ত্তি! বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পাতকি-পরিত্রাণকল্পে পুণ্যক্ষেত্র বেথ্‌লিহমে সাধ্বী সুকুমারী মেরীর শ্রীঅঙ্কে যে মূর্ত্তির প্রথম প্রকাশ, এ সেই পতিতপাবন যীশুমূর্ত্তি; আজ পতিতোদ্ধারে পতিতের সম্মুখে স্বকৃপায় পুনঃপ্রকাশিত!

সাহেব সমাহিত!—ভূতভবিষ্যৎ-সংবিচ্ছিন্ন বর্ত্তমান অস্তিত্ব-মাত্র! বাঁচিয়া আছেন, বসিয়া আছেন, দেখিতেছেন,—সবই করিতেছেন, কিন্তু কর্ত্তৃত্ববোধ বিবর্জ্জিত,—জ্ঞানমাত্র—অহং বোধ-বিরহিত,—শুদ্ধ স্বাকার—বিকার বর্জ্জিত! সম্মুখে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ! জ্যোতির অভ্যন্তরে সেই ভূভারহারী ভবতারণের লীলাভিনয়!—

সেই দারুময় ক্রুস্‌দণ্ড! তদুপরি সংবিদ্ধ সেই শুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ পাবক-পবিত্র ললিত-লাবণ্যধাম—আলম্বিত যীশু-শরীর! মরি মরি, কি সুন্দর—কি রসাল! কি করুণ—কি ভয়াল! সুল-লিত সুবলিত বাহুদ্বয় বিস্তারিত, চারুচিকুরজাল-শোভিত সুন্দর শিরোভাগ ঈষদ্‌বঙ্কিম, ঈষদ্ আনত, বিষম কণ্টকাপীড়-নিপীড়িত! পাতকি-পরমাশ্রয় শ্রীপাদপদ্ম শ্রীচরণান্তরোপরি আরোপিত;

অজস্রধারে সুগাত্রসর্ব্বত্রে রুধিরস্রাব!—যেন মহাধীর মহাবীর ঘোর সংসার-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষতশরীরে মহাবিজয়লাভে, অবশেষে এইবার, সংসারাস্পৃশ্য উচ্চতর নিজ বিজয়-বিমানে নিজ মহিমায় সমারূঢ়! এইবার, যেন ভীত, বিস্মিত, সম্মোহিত সংসার শ্রীচরণে শরণাগত, পদতলে পতিত, লুণ্ঠিত,—'ত্রাহি ত্রাহি, রক্ষ রক্ষ, ক্ষমস্ব' রবে কাতরে করুণাভিক্ষু!—আর, অমনি যেন শ্রীমুখ হইতে সুধাময় অভয়বাণী নিঃসৃত হইতেছে,—"Father, forgive them ; for, they know not what they do. =তাত, ইহাদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করুন্; কারণ, ইহারা কি করিতেছে তাহা বুঝিতে পারে নাই।"

সাহেব কোথায়?—সেই চারু দারুকাসনে। বাঁচিয়া আছেন, না মরিয়াছেন?—বাঁচাও নয়, মরাও নয়,—জ্যান্তে মরা! কি করিতেছেন?—কর্ত্তা গৃহে নাই, করিবে কে?—কেবল, অনিমেষ নয়নদুইটী সম্মুখস্থিত সেই জ্যোতিরালেখ্যে আপনা আপনিই যেন আট্‌কাইয়া রহিয়াছে,—মধুলিট্ মধু লুঠিতে গিয়া, যেন পরাগরেণুতে অন্ধ,—সন্ধ্যাপদ্মে দ্বিরেফ নিবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে।

সহসা মৃদুল মধুরে, ধীরে গম্ভীরে, অভয়ে ভয়ালে, করুণে কঠোরে, অকস্মাৎ অনাহতে, যেন নিঃশব্দে শব্দ হইল,—"O sinner! Have I suffered this for thee, and is this thy reward?=রে রে পাতুকিন্! আমি তোমার নিমিত্ত এই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছি, এই কি তাহার

প্রতিদান ?”—সহসা সাহেবের অসাড় শরীরে অদৃশ্যে যেন শত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহিয়া গেল।

এইবার পাখী পিঞ্জরে আসিল,—সাহেবের সহসা চৈতন্যোদয়!—কি দেখিলাম!—কি শুনিলাম! ভাল করিয়া দেখি, ভাল করিয়া শুনি,—কই! কোথা গেল ?—আর নাই!

যেমন বৈঠকখানা তেমনই আছে, ঘড়ি যেমন চলিতেছিল তেমনই টিক্ টিক্ চলিতেছে, যেমন টেবিল তেমনই সজ্জিত রহিয়াছে, যেখানের আলো সেই খানেই জ্বলিতেছে, যে স্থানের বই সেই স্থানেই পড়িয়া আছে,—সে ধন আর নাই!

হায়, হায়! কি দেখিলাম, কোথায় গেল!—তুষার ধবল শৈল-শিখরে নিঃসারে সুরধুনী-ধারা বহিয়া পড়িল,—সাহেবের নয়নজলে বয়ান ভাসিয়া গেল!—আহা, আহা! কি দেখিলাম! কি শুনিলাম! ‘রে পাতকিন্! তোমার নিমিত্ত—’—হাঁ প্রভো আজ যথার্থই জনিলাম,—হাঁ, আমারই নিমিত্ত, আমারই ন্যায় মহাপাতকীর পরিত্রাণের নিমিত্ত, তোমার এই মহাভীষণ, মহাকারুণিক, অতীব অমায়িক নিঃস্বার্থ আত্ম-বলিদান! আর আমি ?—মহানারকি, মহাকৃতঘ্ন, মহামূর্খ,—প্রভো, আমি তোমার অপার করুণা উপেক্ষা করিয়া শয়তানের সেবক হইয়াছি! প্রভো, আমায় রক্ষা কর; আমি পাপ-ভারাক্রান্ত, আর অগ্রসর হইবার শক্তি নাই, নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছি; প্রভো, আমায় পরিত্রাণ দাও।

সাহেব উচ্ছলিত নেত্রে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে যুক্ত-করযুগলে

অবনতজানু হইয়া নিজ অপরাধভঞ্জন-স্তোত্রপাঠ করিলেন। হৃদয়ের গুরুভার যেন কিঞ্চিৎ কমিয়া গেল। তখন আবার, যেখানে—যে বইখানির উপরে সেই পূর্ণসুধাকরের প্রকাশ হইয়াছিল, সেইখানে মনোযোগ সহকারে দৃষ্টিপাত করিলেন। এবার দেখিতে পাইলেন, গ্রন্থখানির বহিরাবরণের উপরই বৃহদুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে,—'The Holy Bible' = পবিত্র ধর্ম্মপুস্তক।

আহা, ইহারই উপর প্রভুর আবির্ভাব হইয়াছিল!—বাঙ্গালা লেখাপড়া জানা থাকিলে, সম্ভবতঃ সাহেবের তখন মাইকেলের সেই মধুময় কবিতাটুকু মনে পড়িত,—'ফুটে কি কমল কভু সমল সলিলে?'—ভক্তিভরে, কতই ভালবাসিয়া, কতই সমাদর করিয়া গ্রন্থখানি আজ উভয় হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক, এক বার হৃদয়ে আর বার মস্তকে স্থাপন করিতে লাগিলেন; আর ততই যেন মনঃপ্রাণ সুশীতল হইতে লাগিল; আজ যেন সেই পুনঃ পুনঃ পঠিত পুরাতন ধর্ম্মপুস্তকখানি কি এক নূতন সুধাভাণ্ড বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন সযত্নে সেই মহাগ্রন্থের একটি স্থানে খুলিলেন, দেখিলেন লেখা রহিয়াছে,—'Come ye that labour and are heavy laden, and I *will* give you rest.' = এস, এস, পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত মানবকুল, আমি তোমাদিগকে নিশ্চিতই বিশ্রামদান করিব।

সাহেবের হৃদয় এইবার যেন মেঘমুক্ত আকাশের ন্যায় ভারমুক্ত হইল, বিষম বক্ষঃশূল যেন নিঃসারে অপসারিত হইল। সাহেব সুস্থচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন;—

তাই ত, কৃপাময় ত কৃপা করিয়া আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত করিলেন; কিন্তু আমি নরাধম যাহাতে পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ ত্যাগ করিয়া নরকে নিমগ্ন না হই, তাহার উপায় কি? কি উপায়ে আমি শয়তানের পুনরাক্রমণভয়ে নিঃসংশয়ে অভয়লাভ করিব?—প্রভো, মিনতি করি, বলিয়া দাও তোমার অনুগত ভৃত্যকে,—ইহার উপায় কি?

এবং-চিন্তান্বিতচিত্তে সাহেব পুস্তকখানি নাড়িতে চাড়িতে, পুনরায় একটি স্থলে খুলিয়া পড়িল। সহসাই দেখিতে পাইলেন, লেখা রহিয়াছে,—'I am the way.'=আমিই উপায়, আমিই পন্থা।

এইবার যেন মেঘমুক্ত আকাশে সহসা শরৎ-শশীর সমুদয়! সাহেবের সহসা বোধ হইল, যেন সেই বহিঃপ্রকাশিত পূর্ণশশধর ও তদন্তঃস্থ সেই পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার অন্তরাকাশে উদ্‌ভাসিত। সাহেব আনন্দে বিহ্বল, আত্মোল্লাসে উৎফুল্ল! তাঁহার জ্ঞান হইল, যেন জগৎ হইতে শয়তানের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত, জগৎ যেন যীশুময় হইয়া গিয়াছে। যাহা ভাবেন, যাহা দেখেন, সব—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বলা বাহুল্য, উক্ত ভাগ্যবান্ তদবধি মহাভক্ত পূত-চরিত্র আদর্শ খৃষ্টিয়ান্ রূপে জীবনাতিপাত করিয়াছিলেন।

মূর্ত্তি—মূর্ত্তি নয়,—মহাশক্তি! মেয়েমানুষ—মানুষ নয়, মায়া নয়, ছদ্মবেশিনী মহামায়া—সংসার-স্থিতিকারিণী, ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী!

দশম সর্গ।

সে কালে মহেশ বাঁড়ুয্যে বড় জবরদস্ত্ দারোগা। খুন আস্কারা কর্‌তে অমন আর কেউ পার্‌ত না। দুপুর রাত্তিরে প্রত্যেক বাড়ীর আনাচে কানাচে বেড়িয়ে লোকের গোপনীয় কথাবার্ত্তা শুন্‌তো, জেলে সেজে জাল নিয়ে মাছ ধরার ছল ক'রে নদীতে গিয়ে, ঘাটে ঘাটে মেয়েগুলা জল আন্‌তে গিয়ে পরস্পর মনের কথা চাল্‌চে, তা শুন্‌তো; এই রকম ক'রে ঠিক সন্ধানটি নিয়ে, তার পরে আসামীগুলাকে গ্রেপ্তার ক'রে এনে শাসানি, লোভানি, কত রকম কি কর্‌তো; যখন দেখে নিরুপায়, তখন আসামীগুলা সব কথা স্বীকার ক'রে ফেল্‌তো, লাশ্ বার ক'রে দিত।

সহজে সোজা কথায় কি আসল মানুষ বার্ হয়?

আবার সেকালের ডাকাতগুলা কর্‌তো কি,—দুপুর রেতে গেরস্তর বাড়ীতে প'ড়ে, কর্ত্তা বা গিন্নীকে ধ'রে, কত পীড়াপীড়ি কর্‌তো,—কোথায় টাকা পোঁতা আছে বল্।—কিছুতেই বল্‌বে না। বুড়ীর সাম্‌নে তরোয়াল খুলে' বলে,—কাট্‌লাম বুড়ি, বল্ কোথায় টাকা রেখেছিস্। বুড়ী চোক্‌কাণ বুঁজে গলাটা এগিয়ে দিয়ে বলে,—বাবা এই কাট্ বাবা, আমার এক পয়সাও নেই।

শেষে যখন উনোন্ জ্বেলে প্রকাণ্ড একটা কড়াই চাপিয়ে, সেই কড়া'র উপর বুড়ীকে বসিয়ে দিয়ে, তেড়ে আগুনের জ্বাল দেয়, তখনও বুড়ী বলে,—না বাবা, এক পয়সাও নেই।

তার পর, যখন কড়াই তেতে গন্ গন্ ক'রে, তখন বুড়ী বলে,—নামা বাবা, বল্‌চি, বেশি কিছু নেই, আমি গরিব মানুষ; নামা বাবা, বল্‌চি।—দাঁড়া বুড়ি, দাঁড়া! দে জ্বাল্, দে জ্বাল্!—আর বুড়ীর সহ্য হয় না, ছট্ ফট্ করে বলে উঠ্‌লো,—মলাম্ বাবা, মাচার নীচেয়!—ওই মাচার নীচেয় বাবা! এক ঘড়া টাকা, বাবা, এক ঘড়া টাকা; বাবা মোটে এক ঘড়া। উহু, মলাম্ বাবা! আর, এই উনোনের পিঠে, বাবা, এক বগ্‌না মোহর বাবা; আর কিছুই নেই, আমি গরিব মানুষ, খেতে পাইনে বাবা।

বল্ বুড়ি আর বল্, দে জ্বাল্, দে জ্বাল্!—এই বার মরেছি বাবা! ওই কাল চিট্ মোটা বালিশটার ভেতরে গয়না-গুল আছে বাবা!—বাউটী-যোড়াটা নিস্‌না বাবা, আমার সোণা-মণি পর্‌বে বাবা।

তখন, বুড়ীকে নামিয়ে, কেউ নার্‌কেলের তেল আর চূণ লাগিয়ে হাওয়া কর্‌তে লাগ্‌লো, কেউ বা মাটি খুঁড়ে, বালিশ ছিঁড়ে টাকা, মোহর, গয়না বা'র কর্‌তে লাগ্‌লো।

বাপ্‌রে বাপ! মানুষের স্বরূপ বা'র্ করা কি এত কষ্ট!—তবে এ অনিচ্ছায়, আর সাধন স্ব-ইচ্ছায়। কিন্তু, কাম ক্রোধ লোভ মোহ, অহঙ্কার,—মোটের উপর,—মায়া-বুড়ী বড়ই

বজ্জাৎ,—সহজে থেঁই ছাড়ে না। সব ছাড়্লো, তবুও সোণামণির বাউটী ছাড়ে না!

দুঃখ, শোক, উপবাস, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা, অপমান, অভিমান, ভয়, বিস্ময়, অত্যাসক্তি ও এতৎসম্পৃক্ত দেশকাল, অবস্থা, দ্রব্য ইত্যাদি সকলই পরমার্থ-সাধনে মাহাসহায়।

কিন্তু, তাই বলিয়া সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে সকলই ভাল নহে। ক্বচিৎ কদাচিৎ অমৃতে বিষফল, এবং বিষেও অমৃতফল ফলিয়া থাকে। বহিরাচরণ যাহাই হউক্, 'ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ'।

তুমি ভাই শাক্ত, কপালে এক সিন্দূরের ফোঁটা মারিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, ভৈরবী লইয়া, মরার মাথার খুলিতে 'সুধা' পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিতেছ; কর, কিন্তু সাবধান, অমর ভাই! মর যদি ত উদ্ধার নাই।

তুমি ভাই বৈষ্ণব, তিলক পরিয়া, মালাঝুলি লইয়া, কথায় কথায় চৈতন্ লাড়িয়া বচন পড়িতেছ,—'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণঃ'; আচ্ছা, পড় ভাই, সে কথাও সত্য বটে, কিন্তু কেবল বচনে নয়।

তুমি ভাই ব্রাহ্ম, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বলিয়া ষষ্ঠী, শুবচনী, পেঁচপাঁচী প্রভৃতি সাঙ্গোপাঙ্গ সবৎসাগু ওগয়রহ তেত্রিশ-কোটীকে পোকামাকড় পরিজ্ঞানে খ্যাংড়া ধরিয়া বাটীর ত্রিসীমানা হইতে তাড়াইয়াছ; তাড়াও ভাই, ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখো যেন ঠগ্ বাছিতে গ্রাম একেবারেই উজাড় না হইয়া যায়।

তুমি ভাই খৃষ্টিয়ান্, হ্যাট্কোট্ পরিয়া, খানা খাইয়া, যীশু

ভজিতেছ ; ভজ ভাই, সে বটে ভজনের ধন, যে ভজে, সে ভজে তায় ; কিন্তু যদি, ভাবের ঘরেই অভাব রয়, তবে ভোজনটী সার, ভজন নয়।

তুমি ভাই মুসলমান্, মাথায় পাক্ বাঁধিয়া, রুটি গোস্তে পেটটি পূরিয়া, 'আল্লা রসুল' বলিয়া ডাক্ হাঁক্ ছাড়িতেছ ; ডাক ভাই, ডাক ভাই ; এবার ডাকবিভাগের বাহবা বন্দেজ, খেয়ে ডাক, না খেয়ে ডাক, ডাকের মত ডাক্তে পার্লেই হয়।

তুমি ভাই যোগাভ্যাসী, যোগাভ্যাসে অধ্যাত্মচিন্তায় মগ্ন রহিয়াছ, ভারত পুরাণ কেতাব কোরাণ যাহা কিছু, এমন কি, 'বিদ্যাসুন্দরের' পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বাহির করিয়া বাহবা লইতেছ ; লও ভাই লও, কিন্তু কেবল টীকাব্যাখ্যা করিতে গিয়া যেন মূলহারা না হও।

ভাই, তোমরা সকলেই মহৎ, সকলেই ভাল, সকলেই সমাদরের পাত্র, সকলেই একই মহাতীর্থের যাত্রী,—সকলেই পূজ্য। তোমাদের মধ্যে যাঁহারা অকপটাচারী তাঁহাদের শ্রীপাদ-পদ্মে সহস্র প্রণিপাত ; আর যাঁহারা কপটাচারী, কোন না কোন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া কাম ক্রোধ লোভাদির সেবাপরায়ণ, তাঁহারাও নমস্য, তাঁহারাও প্রশস্য, যে হেতু, 'ছিল না কথা, হোলো গাল। আজ না হোক্ হবে কাল॥'

বস্তুতঃ ধর্ম্মের সকলই ভাল, মন্দ মাত্র পরস্পর রোষদ্বেষ নিন্দাদ্বন্দ্ব।

অভীষ্টদেবতার সংজ্ঞা (designation), পরিভাষা বা অভি-

জ্ঞানসূত্র (defination) সর্ব্বত্রই সমান, নাম (name) মাত্র বিভিন্ন।—নিখিল মঙ্গলময়, জীবের ইহপরত্রের একমাত্র গতি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান, অনাথের নাথ, কাঙালের ধন, দয়ার ঠাকুর, ভক্তাধীন, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বান্তর্য্যামী, পরাৎপর পরম দেবতা, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সর্ব্বশক্তির আদি শক্তি, একমেবা-দ্বিতীয়ম্—সে কে ভাই ?—শাক্ত শৈব বৈষ্ণব ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টিয়ান্ সকলেই সমস্বরে বলিবেন—তিনিই আমার উপাস্য দেবতা। এ অবধি সকলেই এক, এ উত্তর সর্ব্ববাদিসম্মত। কিন্তু কি কৌতুক!—যাই জিজ্ঞাসা হইল—তাঁহার নাম কি ? আকার প্রকার কি ? অমনি এক এক জনের এক এক রব! অমনি দ্বন্দ্বের সূত্রপাত, পরে তাহার ক্রমবিকাশ।—

অনন্তপুরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে জীবানন্দ শর্ম্মা শুনিতে পাইলেন—কেবল মহাকোলাহল!—কেহ চীৎকার করিতেছে—বাবা গো, মলাম্ গো, রক্ষা কর গো!—কেহ কাঁদিতেছে,—মা গো, কোলে নে মা, প্রাণ গেল মা!—কেহ আর্ত্তনাদ করি-তেছে,—দোহাই প্রভু, এইবার রক্ষা কর, এইবার বাঁচাও!—কেহ কাতরে কহিতেছে ;—কোথা রৈলে প্রাণনাথ, একবার দেখা দাও!—আবার একটা লোক কাঁদ্‌চে—ওরে আমার জীবনধন অন্ধের নয়ন, বাপ আমার দেখা দে রে!—ওধারে অমনি আর এক জন কেঁদে উঠ্‌লো—হা হা প্রাণবন্ধো, দেখা কি আর পাব না হে!

আরে মোলো! ব্যাপার কি! অনন্তপুরে মহামারি আরম্ভ

না কি ?—ও ঠাকুর, পালাও পালাও, গতিক বড় ভাল নয়, মড়ক্ লেগেছে ! ঘরে ঘরেই মরেছে, ঘরে ঘরেই কাঁদ্‌চে ! ওই শোন কেউ কাঁদ্‌চে—বাবা রে, কেউ কাঁদ্‌চে—মা রে, কোথা গেলি রে !—ঠাকুর এই রৈল তোমার তল্পিতল্পা, আমি কিন্তু লম্বা দিলাম ; না হয় এখনও বল্‌চি—ফিরে চল ;—বলিতে বলিতে বেসো চিন্তারাম জীবানন্দ শর্ম্মার তল্পিতল্পা নামাইতে উদ্যত। শর্ম্মা একটু শক্ত করিয়া তাড়া দিয়া কহিলেন,—কোথা দেখ্‌চিস্ বেটা মড়ক্ ? চল্ না।

কোলাহলের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে অনেক দূর গিয়া সহসা দেখিলেন,—সচ্চিদানন্দ স্বামীর শুভাগমন।

কি বিস্ময় ! স্বামীজীর শুভোদয় মাত্রেই সমস্ত কোলাহলের শান্তি,—অকস্মাৎ বহ্নিতে বারি ! বেসো চিন্তারাম এই বারে জব্দ ! এই অদ্ভুত ব্যাপার, ও দূর হইতে স্বামীজীর রূপপ্রভা ভাবভঙ্গী দেখিয়া সে একেবারে অবাক্ ! আর দাঁড়ায় কে ?—তল্পিতল্পা লইয়া চিন্তারামের একদম্ বেমালুম্ তিরোধান !

কি বিস্ময় ! যাই সচ্চিদানন্দ-সমাগম, অমনি জীবশর্ম্মা একেবারে নিশ্চিন্ত নিঃসঙ্গ ! তাত, মাতঃ, ভ্রাতঃ, বন্ধো ! সখে, প্রভো, প্রেমসিন্ধো ! নাথ,—দয়িত, দুর্গা, রাম ! আল্লা, গড্, হরিহর, ব্রহ্ম ! কৃষ্ণ, খৃষ্ট, হজরৎ, রসূল ! সাঁই, সতীমা, গৌরাঙ্গ, আউল !—ইত্যাদি অনন্ত সম্বোধনে অনন্তপুরবাসী রোরুদ্যমান অনন্তপ্রাণিকুল সকল তাপজ্বালা ভুলিয়া মহোল্লাসে সেই এক মহা-সত্ত্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপে মিলিত হইল !—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অনন্ত শাস্ত্রের অনন্ত কোলাহলে চিন্তাকুল হইয়া, প্রতীক্ষা বা প্রত্যাবর্ত্তন সাধক-জীবের অবিধেয়; অধ্যবসায়ে আপ্তমার্গে অগ্রসর হইলেই সচ্চিদানন্দ-লাভে সর্ব্বাপৎশান্তি সুনিশ্চিত।

রাজা করে স্বর্ণথালে পলান্ন ভোজন,
চাষা পাতি' কলা-পাত,
ক'সে মারে ডাল-ভাত;
যাহার যেমন ক্ষুধা, তৃপ্ত সে তেমন।

হরিদ্বারে ঋষি বসি' নবদ্বার রুধি,'
কুম্ভকে লাগা'য়ে ধ্যান,
হারাইয়ে বাহ্যজ্ঞান;
হৃদি-রত্নাকরে ডুবি' খুঁজিছে যে নিধি,—

হাভাতে হাড়ীর মেয়ে,
সেই খোঁজে খোঁজে গিয়ে,
রুক্ষ মাথা এলো চুল
বৃক্ষমূলে ঢালে ফুল;
ভূমে প'ড়ে মাথা খুঁ'ড়ে ব্যাকুল কাঁদিয়ে।—

হেসো না হে যোগিধ্যানী তত্ত্বজ্ঞানী ভাই!
দেখ ত,—মিটিবে ধাঁধা,—
উহার আঁচলে বাঁধা
যে রত্ন, তোমার কাছে আছে কি তা' নাই!

একাদশ সর্গ।

গুড়ুম্— গড়্‌গড়্ গড়্ গড়্—গগনমেদিনী-বিদারক নিদারুণ বজ্রধ্বনি! ঝিকিমিকি চিকিমিকি চপলাপ্রভা, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত, অন্তরীক্ষ দিগন্তব্যাপী নিবিড় জলদজালাবৃত! কোথায় আর সে পূর্ণ সুধাকর, কোথায়ই বা আর সে সুকুমার কৌমুদীদ্যুতি! ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন নিখিল ভূ-মণ্ডল, অদৃশ্য অজ্ঞেয় অসীম দিঙ্‌মণ্ডল! — আর মেহার? —

নীরব, নিস্তব্ধ, মহান্ধকারে নিরাকার-নিলীন, 'নিশি সুপ্তমিবৈকপঙ্কজং বিরতাভ্যন্তর-ষট্‌পদ-স্বনম্'—যামিনীযোগে মুদিত ভ্রমর-রব-বিরহিত-পঙ্কজবৎ প্রসুপ্ত—মেহার যেন মহামায়াপ্রভাবে মহানিদ্রায় নিদ্রিত! ভীষণ অশনি-নিনাদ, তীব্রোজ্জ্বল বিদ্যুজ্জ্যোতিঃ, মন্দ মন্দ বিন্দুপাত, আপ্রবল পবনপ্রবাহ,—মেহার যেন সর্ব্বেব উপেক্ষাপূর্ব্বক আজ মহাকালবৎ মহামায়াক্রান্ত হইয়া মহাসমাধিতে সমাহিত! আজিকার অমাযামিনীর মেহারপুরী যেন যথার্থই সেই দ্বাপর-কৃষ্ণাষ্টমীর মথুরাপুরী।

অদূরে সরিত্তীরে মহাশ্মশান! শ্মশানোপরি সুবিশাল জিনপাদপ; তন্মূলে মহাসনে মহাযোগী ধ্যানমগ্ন!

পূর্ণচন্দ্রের দেহদণ্ড আপাদমুণ্ড অসাড় অস্পন্দ, প্রাণাপানপ্রবাহ-হীন, অধোমুখে ধরাশ্রয়ে আস্তৃত; পৃষ্ঠপীঠে পদ্মাসনে, নিঃস্পন্দে, নিমীলিত নেত্রে সুখাসীন, স্তব্ধ-সর্ব্বেন্দ্রিয় আমাদের

সেই সর্ব্বসুন্দর,—যেন জড়াপেক্ষাও জড়ীভূত, শবাপেক্ষাও সংজ্ঞাশূন্য! হায় হায়, দেহে বুঝি আর প্রাণ নাই!

চতুর্দ্দিকে ভীষণ শ্মশান,—পবিত্র ভৈরবালয়,—মানবের চির-বিশ্রাম-ভূমি। আশার অবসান, ইন্দ্রিয়ের চিরবিরাম, দ্বন্দ্বের দূরীভাব, দম্ভের পরাভব, মায়ার বিসর্জ্জন, জ্ঞানের উপার্জ্জন এ ক্ষেত্রে যেরূপ, এরূপ আর বিশ্বসংসারে কুত্রাপি নহে। তাই বুঝি, এই পুণ্যক্ষেত্র সাধক-সজ্জনের মহাতীর্থ; তাই বুঝি, সম্প্রদায় বিশেষের ভজনালয় বা সাধন-মন্দির সাধারণতঃ সমাধি-ক্ষেত্রেই সমধিষ্ঠিত।

সাধকপ্রবর সমভাবেই বসিয়া আছেন। ভীমা অমানিশী-থিনী নিজ বিভীষিকা-জালে চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়াছে, ঘোর অন্ধকারে রহিয়া রহিয়া সৌদামিনীর বিকট হাস্য, মস্তকোপরি ভীষণ অশনি-নিনাদ, টুপ্ টাপ্ বৃষ্টিপাত, সন্ সন্ সমীরস্বনন, চতু-ষ্পার্শ্বে শিবাদি-শ্বাপদকুলের আস্ফালন, বৃক্ষোপরি উলূকের গভীর বীভৎস কূজন!—মহাবীর ধীর নিশ্চল,—সমভাবেই বসিয়া আছেন। বহির্বোধ দূর আস্তাং, নিজ অস্তিত্বজ্ঞানও অস্তমিত। কোথায় জগৎ, কোথায় বা আজ সাধের 'সব্বা'! কোথায় পতিত আজ তুচ্ছ ভঙ্গুর পঞ্জর-পিঞ্জর, কোথায় বা চিদা-কাশে উড্ডীয়মান সেই আনন্দময় বিচিত্র বিহঙ্গ! কর্ম্ম নাই, কর্ত্তা নাই, জ্ঞান নাই, জ্ঞাতা নাই, দেশ নাই, কাল নাই,—কিছুই নাই, আছে কেবল সেই মহামন্ত্র,—সেই গুরুদত্ত মহাদেবীর মহাবীজ! শরীর, মন, প্রাণ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সব যেন মন্ত্রৈকমাত্রে

পর্য্যবসিত। বাচক, দর্শক, শ্রাবক, বোধক, সকলই সংপ্রতি মন্ত্রসাৎ! বিশ্বের বিষম বৈষম্য—বিবিধ বৈচিত্র্য, সব যেন মহা-মন্ত্র-সাগরে নিমগ্ন—নিলীন—সমীভূত,—মন্ত্রহুতাশনে ভস্মীভূত! তবে আর, বিভীষিকাদির দ্রষ্টা বোদ্ধা কোথায়? ভয় ভাবনা হইবে কাহার?

ধন্য মন্ত্র! ধন্য সাধক!! ধন্য গুরু!!!

জয় গুরু শঙ্কর,
ভকত-শুভঙ্কর,
ত্রিভুবন-জন-হিতকারী!

মন্ত্র-প্রদায়ক,
তন্ত্র-বিধায়ক,
ত্বংহি ভবার্ণব-তারী!

ধরম-প্রকাশক,
করম-বিনাশক,
মুক্তি-মধুরফল-দায়ী!

প্রণমহুঁ মদ্‌গুরু,
তুঁহি জগদ্‌-গুরু;
জয় পিত শঙ্কর শঙ্করি মায়ি!

দ্বাদশ সর্গ।

ভাল, তুমি আমার কে? জীবনের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছ, দুঃখে সুখ, বিপদে আশ্রয়, সম্পদে আরাম, ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় বারি অকাতরে প্রদান করিতেছ;—অয়ি অবগুণ্ঠনবতি!—বলি, তুমি আমার কে? জীবোদ্ধারিণি, জীবনে কি আর তোমার ও অবগুণ্ঠন মুক্ত হইবে না? জীবের ভাগ্যে কি আর তোমার স্বরূপদর্শন ঘটিবে না?

বায়ুভূত নিরাশ্রয় ছিলাম আমি; মা, তুমি গর্ভে আশ্রয়দান করিয়া, নিজ দেহ-শোণিতে এ দেহের নির্ম্মাণ সাধন করিলে! আবার যেদিন সেই অন্ধকূপ-কারামুক্ত হইয়া ধরাশায়ী হইলাম, অমনি এ ধূলিলুণ্ঠিত দেহ কতই স্নেহে শ্রীঅঙ্কে তুলিয়া লইয়া, মুখে অমৃতধারা বর্ষণ করিলে! কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম,—কি ছিলাম, কি হইলাম,—কত কি ভাবিয়াছিলাম, কত কি কহিয়াছিলাম, তোমাকে পাইয়া সব ভুলিলাম; তোমার চন্দ্রবদন দেখিয়া নয়ন-মন মুগ্ধ হইল, স্তন্যামৃতে দেহ প্রাণ সুশীতল হইল, ধরা যেন অমৃতে ভরিয়া গেল!—বলি, অয়ি অমৃতময়ি! তুমি আমার কে?

তোমার স্নেহ-নীড়ে লালিত পালিত হইয়া, ক্রমশঃ যখন বাল্যাতিক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলাম, অমনি আবার, অয়ি কামরূপিণি, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী বেশে ভুবন উদ্ভাসিত করিয়া,

নীরবে আমার বামপার্শ্বে আসিয়া বসিলে ; সুন্দর বসনভূষণে শ্রীঅঙ্গ আবৃত ; ভাল করিয়া দেখা,—দাও দাও, দাও না,—কথা—কও কও, কও না,—যেন চিনি চিনি মনে করি, চিনিতে পারি না ;—বলি, অয়ি অচিন্ত্যচরিতে ! তুমি আমার কে ?

উদ্দাম ইন্দ্রিয়দাম-বিক্ষোভিত মানস যখন প্রমত্ত মহিষাসুরবৎ উদয়াস্তাচল উল্লম্ফনে সমুদ্যত, অলঙ্ঘ্য বিধাতৃবিধান বিলঙ্ঘনে বদ্ধপরিকর, তখন সুদৃঢ় প্রণয়-নিগড়ে নিবদ্ধ করিয়া, আমার সেই উন্মার্গগামী দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত চিত্তের দমনপূর্ব্বক, পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গবৎ স্বসঙ্গ-সম্বদ্ধ করিয়া রাখিলে ! তোমার অসীম শক্তিপ্রভাবে কতবার কতই কুম্ভীপাক-পতনে পরিরক্ষিত হইলাম !—অয়ি পতিতপাবনি মহাশক্তি মহিষমর্দ্দিনি ! তুমি আমার কে ?

ক্রমে যখন সন্তান-জনক সংসারী হইলাম, প্রভাতপ্রারম্ভে প্রদোষযাবৎ অশেষ বিধিবিধানে আজীব্য আহরণে ব্যতিব্যস্ত, স্বিন্ন ক্লিন্ন কলেবরে ম্লানমুখে গ্লানচিত্তে, পথ্যাশী পিপাসু—মুমূর্ষু-বৎ দিনশেষে ক্ষীণশ্বাসে, অপার্য্য-পাদসঞ্চারে যখন আমি আমার জীর্ণ পর্ণ-কুটীরদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত, অমনি দেখি,—তুমি, বিশ্বময়ি, বিশ্ব আলোকিত করিয়া, আমার পর্ণশালা স্বর্ণশালায় পরিণত করিয়া,—গৃহলক্ষ্মি, গৃহমধ্যে তুমি আমার পিপাসার বারি, ক্ষুধার অন্ন সজ্জিত রাখিয়া, আমার আনন্দ-গোপালকে অঙ্কে লইয়া,—মরি মরি,—ভুবনমোহিনী-বেশে আমারই আগমনপ্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিতাপ্রায় উপবিষ্টা !—অয়ি গণেশজননি ! তুমি আমার কে ?

সন্ধ্যাকালে গৃহবহির্গত হইয়া, কর্ত্তব্যানুরোধে নানাস্থান পরিভ্রমণের পর, অর্দ্ধরাত্রে যখন গৃহ-প্রত্যাগত হইলাম, দেখি সকলেই পানভোজনে পরিতৃপ্ত, স্ব স্ব শয্যায় সুষুপ্ত, মাত্র তুমি, করুণাময়ি, আমার নিমিত্ত অনাহারী অনিদ্রিত!—কতই আহ্লাদে আসিয়া কণ্ঠাশ্লেষে সুমধুর সম্ভাষে আমার শুষ্ক কর্ণে সুধাধারা ঢালিয়া দিলে, কি অদ্‌ভুত মৃতসঞ্জীবন মন্ত্রে মৃত প্রাণের জীবন্যাস করিলে! পরিহিত বস্ত্র-প্রান্ত ধারণে অগ্রণী হইয়া, শ্রীচরণমঞ্জীর-শিঞ্জিতে মনোহরণ-পূর্ব্বক লাবণ্য-লতিকার ন্যায় ক্রমশঃ প্রসৃত হইয়া, ভোজন-স্থানে লইয়া, সাদরে সহ-ভোজনে সমাসীনা! মরি মরি, কি মধুর সুধালাপ!—'তুমি কিছু খাও নাই, তাইতে, আমিও এত লাত্‌ কিছু খাইনি বাবা।'—আ মরি, আমারই তরে এত মায়া!—ওমা মায়াময়ি খুকুরাণি!—অয়ি সুকুমারি স্বর্ণগৌরি!—তুমি আমার কে?

অয়ি জীব-জননি, জীব-পালিনি,—জীব-মোহিনি, জীব-গেহিনি,—জীব-নন্দিনি, জীব-রঞ্জিনি!—বলি, তুমি জীবের কে?

সর্‌ আইজাক্‌ নিউটন্‌ অসীম প্রতিভা-প্রভাবে বহুভাবনায় বহু যত্নে মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব বিনির্দ্দেশে ভূ-বিজ্ঞান-রহস্যের অর্গল মোচন করিয়াছেন, সত্য, কিন্তু অয়ি বিশ্বাকর্ষিণি, বিশ্বরশ্মি-বিধারিণি, বিশ্বম্ভরে, বিশ্বরমে! তুমি এই বিশাল বিশ্বের কেন্দ্রীভূত হইয়া, যে অলৌকিক আকর্ষণে সৃষ্টিসমষ্টির অবি-সংবাদ সমাবেশ করিয়া রাখিয়াছ, তোমার এ অচিন্ত্য অসীম মহাকর্ষণ-শক্তি—এ মহাতত্ত্বের নির্দ্দেশ মানুষের অসাধ্য। সত্য

ত্রেতা দ্বাপর কলি কতবার আসিল, কতবার গেল, কত সৃষ্টি কত প্রলয় সংঘটিত হইল, তোমার শক্তি—অয়ি সর্ব্বশক্তি-সঞ্চারিণি মহাশক্তি !—তোমার অপরাজেয় অদ্‌ভুত শক্তি অনাদি অনন্ত কালই অক্ষুণ্ণ রহিল, এবং রহিবেও ।

অয়ি শক্তিরূপে সনাতনি, বিশ্বমাতঃ বিশ্বময়ি, মহামায়ে মহা-লক্ষ্মি ! মা তোমার যোগিধ্যেয় শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণিপাত !

যথার্থই জানিলাম, তুমিই সংসার-স্থিতিকারিণী আদ্যাশক্তি মহামায়া ; যথার্থই জানিলাম, ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত এ বিশ্বসংসার —হে বিশ্ব-বিমোহিনি !—মা, তোমারই মায়ায় বিমোহিত। জানিলাম,—ত্রিজগতে জীবের 'আমার' বলিতে যদি কেহ থাকে, তবে সে তুমিই ; এ বিশ্বের 'ব্যথার ব্যথিত' যদি কেহ থাকে, তবে সে একমাত্র তুমিই ; কালের কলয়িত্রী, এ বিশ্ব-ব্রহ্মঅণ্ডের অন্তর্ব্বর্ত্তী, ভূতের ভাবিনী, চেতনের চেতনা, জীবের জীবন, প্রাণীর প্রাণ বলিতে যদি কিছু থাকে, তবে সে তুমিই ।

অতএব, অয়ি সংসারের 'সর্ব্বস্ব ধন,' 'সর্ব্বেসর্ব্বা'-স্বরূ-পিণি ! 'নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ' !

মা তুমি ভাস্করে ভাঃ, সুধাকরে সুধা, জলদে তড়িৎ, হিমাচলে গৌরী, কৈলাসে শঙ্করী, কাশীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা, বৃন্দাবনে নন্দগেহিনী, নবদ্বীপে শচীমাতা, বুদিয়ায় মেরী, মক্কায় ফাতিমা, ইংলণ্ডে ভিক্‌টোরিয়া, আর মেহারে আজ মা তুমি ভট্টাচার্য্যগৃহে আমাদের ছদ্মবেশিনী ছোটবধূ ।

মা এখন কোথায় ? দিন ত অনশনেই অতিবাহিত। সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্তা মা-লক্ষ্মী উপবাসে, চিন্তায়, অভিমানে ম্রিয়মাণা হইয়া, নিজ শয়ন-মন্দিরে নিদ্রাগতা। কোথায় গিয়াছেন পতি, কোথায় বা আছেন পূর্ণচন্দ্র, মায়ের আমার কিছুই আর জ্ঞান নাই। গৃহ অন্ধকারাবৃত, তন্মধ্যে মৃত্তিকাশয়নে শয়িত সেই সুন্দর স্বর্ণপ্রতিমা,—যথার্থ ই যেন 'ভূমিতে চাঁদ উদয়!' দীপ নির্ব্বাণ, কিন্তু মানসপ্রদীপে মায়ের রূপ আলোকান্ধকারে সম-দেদীপ্যমান!—

প্রথমে শ্রীপাদপদ্ম; কিন্তু, শতদল তাহার তুলনার স্থল নহে, তবে, জবা-বিল্বদল সহ সচন্দনে সে চরণে স্থান পাইবার যোগ্য বটে। তাহাতে সর্ব্বাদৌ বিধাতাই যেন যাবক-রাগ-সংযোগ করিয়া রাখিয়াছেন, পুনর্ব্বার আর কাহারও পরাইয়া দিবার প্রয়োজন বা অধিকার আছে বলিয়া বোধ হয় না। চির-মুখরাধীর মধুরগুঞ্জরী শ্রীমঞ্জীর কদাচিৎ নিদ্রাবেশ-বিচালিত শ্রীপাদপদ্মদ্বয়ে দ্বিরেফ-ঝঙ্কার করিতেছে; নতুবা গৃহ নীরব।

সহসা বিদ্যুৎপ্রভা বাতায়ন-পথে চকিতে প্রবেশ করিয়া, কি দেখিয়া কি ভাবিয়া, চকিতে অমনি যেন সসম্ভ্রমে চলিয়া আসিতেছে,—বুঝি স্বকীয়ালোকে দেখিয়া আসিতেছে,—সেথা অলৌকিকাক্ষরে লিখিত,—সুরাসুর-কিন্নর-নর-যক্ষ-রক্ষঃ সর্ব্ব পক্ষেই আজ সে গৃহে—'প্রবেশ নিষেধ'। দ্বার রুদ্ধ; কে যেন তথায় সাক্ষাৎ তমঃস্বরূপ বিশাল-ভীষণ-মূর্ত্তি দ্বাররক্ষক-রূপে দণ্ডায়মান! সে ঘোর তমঃ-শরীরীর প্রতি একবার নেত্র-

পাত করিলে, আর বার সেদিকে নয়নোন্মীলনে নর-প্রাণ সাহসী হয় না।

মায়ের শ্রীপাদপদ্মের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে পরিহিত-বসনের জাজ্বল্যমান-লোহিত প্রান্তভাগ ঔজ্জ্বল্যে যেন সীমন্তস্থ সুন্দর সিন্দুর-বিন্দুর বর্ণচ্ছটার প্রতিস্পর্দ্ধা করিতেছে। দেহ-বল্লীর আবরণ-বস্ত্রখানি যেন স্বয়ং শান্তি-মাতার বস্ত্রাঞ্চলরূপে তাঁহার প্রাণাধিক ধনকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মা আমার এখন সুশান্ত, সুধীরে সুষুপ্ত। চিরস্বাভাবিক সম্ভ্রমশীলতায় চিরচেলা-বৃত চুচুকদ্বয় অবসর বুঝিয়া অনাবৃতে কত সুধা-তৃপ্ত অশরীরী সুরসমূহেরও পীযূষ-পিপাসার পুনরুদ্রেক করিতেছে; দেখিলেই যেন জন্মমরণাতীত নিত্যমুক্ত নিত্যসিদ্ধেরও সাধ হয়,—একবার ঐ ক্ষীণোদরে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীঅঙ্কাশ্রিত হইয়া ঐ পীন-পয়োঘটের পীযূষপানে পরিতৃপ্ত হই, একবার মা মা বলিয়া মায়ের স্নেহাদরলাভে মনঃপ্রাণ সুশীতল করি। সত্যই কি তবে এই সুধা-ভাণ্ডেরই সুধাধারাস্বাদনে নীলকণ্ঠের অসহ্য বিষজ্বালা জুড়াইয়াছিল?

বক্ষে স্বর্ণহার; সুবর্ণের আজ কি বাহার! সে ত হার নয়, যেন সৌদামিনী নীল নীরদাবস্থানে অস্থির হইয়া, স্ব-বর্ণময় সুন্দর সেই হৃদয়-সরোজে আসিয়া আজ সুস্থিরে বিরাজমান। সুললিত গলদেশ সুদৃশ্য শঙ্খরেখাত্রয়ে সুশোভিত; তদুপরি মুখমণ্ডল, যেন মৃণালোপরি প্রফুল্ল পঙ্কজপ্রকাশ; তদুপরি বালার্কবিম্ববৎ ভালপ্রান্তে সিন্দূর-শোভা! কেশদাম উন্মুক্ত;

মা আমার আজ কবরী-বন্ধন করেন নাই। সেই সুচারু চিকুর-জাল-পার্শ্বে বদনমণ্ডল, যেন জলদপ্রান্তে পূর্ণ শশধর। স্বর্ণ-দ্বিরেফাবলি-পরিবেষ্টিত সুকোমল কর-কমলদ্বয় ভূমে অবলুণ্ঠিত। চৈতন্যরূপিণী ঘুমে অচেতনা।

শ্রীদর্শনে অনুমান, যেন কি এক অলৌকিক কমল-লতিকা কোন্ লোক হইতে ইহ লোকে সহসা খসিয়া পড়িয়াছে; মূলে শীর্ষে পার্শ্বে প্রফুল্ল পঙ্কজরাজি বিরাজিত। প্রভায় প্রতীয়মান, যেন কোন্ এক অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইয়া অকস্মাৎ অবনীবক্ষে নিপতিত!

নাসাগ্রে ভালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম পরিদৃশ্যমান; রহিয়া রহিয়া শ্রীমুখে মৃদু মৃদু স্মিতশোভা!—মা বুঝি আজ নিদ্রাবেশে কোথায় কি রঙ্গে রঙ্গময়ী! তবে কি শ্মশানাসীন যোগমগ্ন সর্ব্বানন্দময়ের তথা এই যোগ-নিদ্রাগতা যোগমায়া-স্বরূপিণীর উভয়ান্তরাত্মা এখন কোন্ লোকে কি এক মহাযোগে সংযুক্ত? তাই, আনন্দ-ময়ীর এ আনন্দহাস্য?

ত্রয়োদশ সর্গ।

ক্রমশঃ সমস্তই সুস্থির। পবনপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, চপলার চাকচিক্য ক্রমশঃ সকলই নিরস্ত, অম্বরতল মেঘাম্বরাবৃত নিঃশব্দ, অবনীতল সুগম্ভীর ধীর,—তিমিরাস্তরালে নিস্তব্ধ! প্রকৃতি যেন সসম্ভ্রমে কি এক শুভক্ষণের প্রতীক্ষমাণা। মেহার অচৈতন্য, রাজবাটীর প্রহরীও বুঝি সংপ্রতি অজ্ঞাতসারে নিদ্রা-নিহত!

'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী';—জাগিতেছেন আজ কেবল সর্ব্বানন্দ, জাগিতেছেন পূর্ণানন্দ, জাগিতেছে আজ মেহারের সেই মহাশ্মশান!

রাত্রির তখন তৃতীয় প্রহর প্রবৃত্ত। সহসা বিষম ভূ-কম্পন! কি ভীষণ! ভূমি কম্পিতা, আসনভৃত শবপ্রায় পূর্ণানন্দ প্রকম্পিত, মহান্ জিন-পাদপ মর্ম্মর ঝর্ঝর নাদে আন্দোলিত, তদুপরি লুক্কায়িত বিহগকুল ঝট্ পট্ পক্ষসঞ্চালনে সহসা নীড়-চ্যুত, শ্মশানচারী ফেরুপাল সন্ত্রাসিত—শব্দপরায়ণ; সর্ব্বানন্দ সহসা শিহরিত!—সহসা মীন যেন অগাধ জলতল হইতে একবার ভাসিয়া উঠিল!—

'এ কি! ভূমিকম্প! তবে কি আজ ধরিত্রী রসাতলনিমগ্না হইবেন?—যাহা হয়, হউক্, উঠিব না। এ পাপজীবনেব অবসানই মঙ্গল।'

অমনি সব সুস্থির! আবার ধরা ধীরা। আবার অগাধের মীন অগাধে ডুবিতে চলিল।

হিহি হিহি!—হঠাৎ বিকট হাস্য!

'এ কি! কোথা হইতে কে হাসিল!—যে হাসে, হাসুক্; গুরু হাসিতে দেন, ত আমিও আবার হাসিব, নচেৎ, সকল হাসি-কান্নার এ অবধি অবসান!'

আবার সব নিস্তব্ধ। মহামন্ত্র যন্ত্রবৎ যেন স্বতঃই চলিতেছে। গভীর রজনীতে নিদ্রাগত আরোহীকে বক্ষে ধারণ করিয়া—বাষ্পযান নিজ বাষ্প-শক্তিতে,—সমানে সমধিক সচল হইয়াও—যেমন নিশ্চলবৎ চলিতে থাকে, আজ এই ঘোরা অমাযামিনীতে গুরুদত্ত সেই মহাশক্তির মহামন্ত্রও সেইরূপ সর্ব্বানন্দের ঐকান্তিক আশ্রয়ভূত হইয়া, স্বীয় অসীমশক্তিতে যেন স্বতঃই সমানে চলিতে লাগিল; সে গতি রুদ্ধ করে—সাধ্য কাহার? এখন ওষ্ঠ, রসনা, স্বরযন্ত্র সকলই অবসরপ্রাপ্ত; মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, শিরায় শিরায়, মজ্জায় মজ্জায় মন্ত্রজপ চলিতেছে; পরার্দ্ধ বদনবৎ পরার্দ্ধ রোমবিবরে যেন সেই মহামন্ত্র অনর্গল উচ্চারিত হইতেছে; সর্ব্বেন্দ্রিয় যেন সমস্বরে মন্ত্রসাধনে নিরত; মেরুদণ্ডাভ্যন্তরে কোদণ্ড-টঙ্কারবৎ চতুর্দ্দল হইতে সহস্রদলপর্য্যন্ত নিরবচ্ছেদে মন্ত্রধ্বনি-প্রতিধ্বান! সমগ্র বহির্বাত-সাগরও যেন মন্ত্রহিল্লোলে সমুদ্বেল; চতুর্দ্দশ ভুবন যেন নিরন্তর মন্ত্রতালে নৃত্যপরায়ণ; এমন সময়,—সহসা নিশাবসান!

এইবার সব ফুরাইল! এত উদ্যম, এত উদ্যোগ, এত অধ্যবসায়, এত নিষ্ঠা, এত আশা, এত ভরসা,—সব শেষ হইল! এই যে, রাত্রি একেবারে ভোর হইয়া গেল! কোথায় মা

রইল সন্ন্যাসিগুরুর আশ্বাসবাণী, কই বা হইল আর ব্রহ্মময়ীর কৃপালাভ !

দূরে কাককুল কা কা শব্দে সবিতার শুভাগমন ঘোষণা করিতে লাগিল ; দিঙ্মণ্ডল উষালোকে ক্রমশঃ উদ্ভাসিত ; প্রাতঃসমীরণ ধীরে প্রবাহিত ; শিবাদি শ্বাপদ-দল অদৃশ্য ; পূর্ব্বাকাশে ক্রমশঃ অরুণাভাস পরিদৃশ্যমান।—হায় হায়, অভাগার ভাগ্যে কি এইরূপই ঘটে !

সাধক সুস্থির ; সহসা চমকিত,—তথাপি অচঞ্চল ; সহসা হতাশ্বাস,—তথাপি স্থির-বিশ্বাস ; মনঃপ্রাণ যেন বারেক বহিরাকৃষ্ট,—তথাপি মন্ত্রানিবিষ্ট।

কিয়দ্দূরে প্রবাহিণী-কূলে একটী ষোড়শী-মূর্ত্তি কতকগুলি বস্ত্র লইয়া, জলে নামিয়া ধৌত করিতে লাগিল, আর সর্ব্বানন্দের প্রতি বার বার কটাক্ষ-ক্ষেপণে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সর্ব্বানন্দ উন্মীলিত চক্ষে এ দৃশ্য চাহিয়া দেখিলেন। দূরে একদল রাখাল-বালক কোলাহলপূর্ব্বক তাঁহার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া হাস্য করিতেছে।—সকলই দেখিতেছেন, কিন্তু নির্ব্বাক্, নিশ্চল, মন্ত্রপরায়ণ।

'রাত্রি প্রভাত হইল, দিবা আসিল !—আসুক্, দিবাবসানে পুনর্ব্বার নিশা আসিবে ; এই স্থানে এই অবস্থাতেই থাকিব ; যাহা ঘটে ঘটুক্, এই শ্মশানেই চিরশয়ান রহিব, তথাপি ভঙ্গ দিব না।'—এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া সাধক নিশ্চিন্তে নিশ্চলে শ্রীগুরুর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিলেন।

কি কুহক! দিবালোক মুহূর্ত্তে অন্তর্হৃত! কোথাকার ষোড়শী, কোথাকার রাখালদল কোথায় সব পলাইল! ঝিল্লীরব-ঝঙ্কারিত অমাযামিনীর ঘোরান্ধকারে সকলই আবার সমীভূত হইয়া গেল। সর্ব্বানন্দ ক্রমশঃ পুনর্ব্বার অবাধে অগাধে নিমগ্নপ্রায়! সহসা সকরুণে শব্দ হইল,—

'বৎস, আমি আসিয়াছি, গাত্রোত্থান কর।'—

নিমীলিত নেত্র সহসা পুনরুন্মীলিত হইল;

দেখিলেন,—সম্মুখে জননী সমুপস্থিত!—'বৎস, তোমার এ কষ্ট আমার প্রাণে অসহ্য, আর কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি ধন্য, তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়া আমিও ধন্যা! বৎস, কোথায় শুনিয়াছ যে, কলিযুগে প্রত্যক্ষ দেবদর্শন হয়? তুমি যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছ, ইহা এ যুগে দুঃসাধ্য। এই অবধি ক্ষান্ত হও। এক জন্মেই কি ইষ্টসিদ্ধি হয়? এ জন্মে ইহাই যথেষ্ট, পুনর্জ্জন্মে অনায়াসেই ইষ্টলাভ হইবে; ক্ষান্ত হও, আর বৃথা কষ্টস্বীকার করিও না। তুমি আমার নয়নের মণি, স্নেহের পুত্তলি; মায়ের প্রাণে আর কষ্ট দিও না; বাপ্, আমার, নিরস্ত হও।'

সাধক স্বকর্ণে শুনিলেন, স্বচক্ষে দেখিলেন,—স্বীয় স্বর্গতা গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতা সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া আর্ত্তস্বরে স্নেহভরে উক্তরূপ অনুনয়বাক্যে সাধনে নিবৃত্ত হইতে কহিতেছেন।

মহা সমস্যা! কিন্তু বীর সাধকের বলীয়ান্ হৃদয় আজ

হিমাচলবৎ অবিচল। তিনি চক্ষু মেলিয়া এ দৃশ্য দেখিবামাত্র যোগাসনে বসিয়াই অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। মন্ত্রগতি কিন্তু অবিরাম অব্যাহত। অন্তস্তল হইতে অবাঙ্‌ময় অভাষিত ভাষায় উত্তর হইল,—

'মা, শ্রীপাদপদ্মে কোটি কোটি প্রণিপাত! যদি অকৃতী সন্তানের প্রতি কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে, আশীর্ব্বাদ করুন্, যেন অব্যাহত অনুষ্ঠানে অচিরেই অভীষ্টসিদ্ধি হয়, নচেৎ, প্রভাত-পূর্ব্বেই যেন এই শ্মশান-শয্যায় আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে চিরশয়ান হই।'

'ধন্য বৎস! অচিরেই অবাধে ইষ্টলাভ কর'—এই আশীর্ব্বচনের সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বর্গীয় মাতৃমূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান!

এইবার শ্রবণ-নয়ন সকলই বিশ্রামলাভ করিল; বাধাবিঘ্ন, মায়ামোহ, সকলই নিরস্ত। মহাপুরুষ পুনর্ব্বার মহাযোগ-সাগরে নিমগ্ন!

চতুর্দ্দশ সর্গ।

আচম্বিতে কৈলাস-ভূধর
থর থর প্রকম্পিত! প্রমাদ গণিলা
প্রমদ প্রমথগণ,—প্রলয়ে যেমতি
মর্ত্ত্যপুরে নরকুল;—বিষম সন্ত্রাসে
সবে আসি ঊর্দ্ধশ্বাসে,—বসি বিশ্বমাতা
বিশ্বনাথ-বামে যথা,—লইলা শরণ
অনন্যশরণ, আহা শিশুকুল যেন
মায়ের অমিয়-ক্রোড়ে—চিরাভয়-ধাম
এ ভয়াল ভবধামে। সস্মিতে ঈশানী,—
ঊষার ঈষৎ হাসি বিশ্বতমোরাশি
নিমিষে বিনাশে যেন,—নিমিষে বিত্রাসি
মহাভীত ভূতগ্রামে অভয়প্রদানে
অভয়া, কহিলা মাতা বিনয়বচনে
চাহি চন্দ্রচূড়পানে,—
"জাগো যোগীশ্বর,
যোগনিদ্রা পরিহরি, চাহ কৃপা করি
কৃপাময়, কৃপানেত্র বারেক উন্মীলি
চাহ চিরদাসীপ্রতি; হে কৈলাস-পতি,
দেখ হে কৈলাস তব কেন হেন ঘন

কম্পমান ? কে কোথায়, কি হেতু, না জানি,
আজ আবার,—বিবরিয়া কহ বিশ্বনাথ,—
কে ডাকে কাহারে প্রভো ? কি তপঃপ্রভাবে,—
কেবা হেন ভাগ্যধর,—লভিলা হে ভব
তব কৃপা ? কোন্ জন তেমার ইচ্ছায়
ঈচ্ছাময়, কহ শুনি, কি তপঃপ্রতাপে
টলাইলা এ কৈলাস—বিলাসসদন
অটল আনন্দাচল চিদানন্দ-ধাম
মহেশের ?

মর্ত্ত্যধামে প্রবৃত্ত কি পুনঃ
ত্রেতাযুগ ? যুগ্মদেহে অবতীর্ণ এবে
পুনঃ কি বৈকুণ্ঠ ত্যজি বৈকুণ্ঠের পতি
শ্রীপতি শ্রীমতী সহ ? হরিলা সীতায়
পুনঃ কি দশাস্য-শূর ? ডাকিছে কি আজ
বিষম সঙ্কটে পড়ি লঙ্কাধামে আহা
অসহায় রঘুপতি, নীলপদ্মাঞ্জলি
লয়ে করপদ্মযুগে, মা বলিয়ে বাছা
ডাকিছে কাতরে,—নাথ কহ কৃপা করি,—
প্রণাকুল প্রাণকান্ত,—ডাকিছে কি রাম
এ তব দাসীরে আজ ?

কিম্বা হে ত্র্যম্বক
মহাকাল, কালচক্র-আবর্ত্তনে তব

প্রত্যাবৃত্ত মর্ত্ত্যপুরে বুঝি পুনর্ব্বার
দ্বাপর ; আবার হরি অবতীর্ণ বুঝি
দ্বিভুজ মুরলীধর-মূরতি ধরিয়া
বৃন্দাবনে নন্দ-গৃহে স্বরূপে,—সাক্ষাৎ
মন্মথ-মন্মথ-বেশ ; প্রেমাবেশে মত্ত
গোপীকুল আত্মহারা, কালিন্দীর কূলে,
লভিতে দুর্লভ সেই পরমাত্ম-ধনে,
কাত্যায়নী-ব্রতে রত, অবিরত আহা
অনাহারে অনিদ্রায় পাগলিনী প্রায়,
'কোথা মা করুণাময়ি মহেশ-মোহিনি,
কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায়িনি পরমা বৈষ্ণবি,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি' বলি,—
উহু, উহু মরি, নাথ রহিতে না পারি,
কহ ত্বরা কৃপা করি, কে ডাকে কোথায়
চিরকিঙ্করীরে তব, কহ হে শঙ্কর !—
কাঁদিছে কি সে অবলা কুলবালা-দল,
মিশাইয়ে অশ্রুজল যমুনার জলে ?—
অথবা কি কলিযুগে জনমিলা পুনঃ
দ্বিতীয় খুল্লনা-পুত্র ; পিতৃভক্ত-রূপে—
তুমি ত্রিজগৎ-পিতা,—তব ভক্ত, আহা
আমার স্নেহের ধন, শ্রীমন্ত সুমতি
অবতরি ধরিত্রীরে পবিত্রিলা পুনঃ ?

সিংহল-পাটনে বাছা,—পিতার উদ্দেশে
বিদেশে বন্ধন-দশা,—মশানে নিশিত
অসি-ঘাতে শিরশ্ছেদ জানিয়া নিশ্চিত,
দশদিশ্ শূন্যময় হেরি আজ্ আবার,
মা মা বলি অবিরল ভাসি অশ্রুজলে
হা হুতাশে কাঁদে শিশু? কহ বিশ্বময়,
এ বিশ্বে দাসীরে আজ ডাকে কে কোথায়?
অচল চঞ্চল, কেন অস্থির হৃদয়?”

নির্ব্বাত জলধি-সম শান্ত সুগম্ভীর
রজত-নগেন্দ্র-বপুঃ বসি বিশ্বনাথ
বিশ্বমাতা-বামেতরে,—অদ্বয়ের দ্বন্দ্ব
আহা-মরি কি সুন্দর! উভয়েতে এক
একেতে উভয় যেন!—মহা যোগানন্দে
মগ্ন দোঁহে; অকস্মাৎ ভবানী-আহ্বানে
ভাঙিলা ভবের ধ্যান। হাসি মৃদুভাষে
কহিলা কৈলাস নাথ,—

“কৈলাস-ঈশ্বরি,
কি না তুমি জান দেবি? সর্ব্বান্তর্যামিনি
হে শর্ব্বাণি, কহ শুনি, এ বিশ্বসর্ব্বত্রে
কিবা তব অগোচর; চরাচরচয়—
নিখিলে তোমারি খেলা। আমি যে শঙ্কর
মৃত্যুঞ্জয় মন্মথ-বিজয়ী ত্রিকালজ্ঞ

মহাকাল, সে কেবল তব কৃপাবলে
মহাকালি ; তুমি শক্তি হৃদে বিরাজিতা
অহরহঃ, তাই শিব, নতুবা ত শুধু
মৃত্যু-সার শবমাত্র—জানে সবে ভাল,—
এ তব পাগল ভোলা। তারি প্রতি আমি
কৃপাবান্, কৃপাদান কর তুমি যারে
কৃপাময়ি ; মতি-রূপে হৃদয়-কন্দরে
বস যার গুণময়ি হে বিন্ধ্যবাসিনি,
গুরু-রূপে গতি-দান করি তারে আমি
ততঃপর।—
তব অংশ সুধাংশু-বদনি
ভূলোকে—ভুলেছ নাকি ?—মেহার-নগরে
বসে সর্ব্বানন্দ-গৃহে গৃহিণীর রূপে
সংপ্রতি ;—সৌভাগ্য তার অপার অসীম,
প্রাক্তন পুণ্যের ফল ;—প্রতিশ্রুতি তুমি
দিলা তারে পূর্ব্ববারে,—ধন্য নর-কুলে
অমর সে ভাগ্যধর,—দেখা দিয়া দেবি
করিবে কৃতার্থ মরি এবারে ; করিনু
গুরু-রূপে কৃপা তাই গিয়ে মর্ত্ত্যভূমে
তব কৃপা-পাত্রে আমি। সতী পতি-প্রাণা
তব প্রতিচ্ছায়া সে যে নবনীর ছবি,
স্নেহের পুতলি মোর, অনশনে আহা

ধুলায় ধূসর বালা, প্রাণান্ত স্বীকারে
একান্ত করেছে পণ পতির কল্যাণ
সাধিবারে! তাহে, মহা শ্মশান-সাধনে
সমাহিত সর্ব্বানন্দ! সাধে কি সুন্দরি
কৈলাস-আসন ঘন টলমল আজি;
সাধে কি সহসা তব ব্যাকুল হৃদয়,
ভক্তজন-সহৃদয়ে?—
ভূলোকে সংপ্রতি
নিশা অবসান প্রায়; যাহা ইচ্ছা হয়,
কর আশু ইচ্ছাময়ি। অসহ্য আমার
তোমার স্ব-সত্তাময়ী সতীর সন্তাপ
চিরকাল চারু-নেত্রে; চিরকাল প্রিয়ে
সতী গতি শঙ্করের। যদি উপবাসে
মনঃক্লেশে মরে বালা, প্রলয় পাড়িব
অব্যর্থ অবনিতলে, পাড়িনু যেমতি
দক্ষালয়ে, জান দেবি, তব দেহত্যাগে।”

শ্রীশঙ্করী।—কার সাধ্য আর প্রভো প্রতিরোধে গতি
ভাগ্যোদয়-পথে তার, তুমি যার প্রতি
করুণা-কটাক্ষে চাহ? কহ বিরূপাক্ষ,
কি আজ্ঞা; পালিব আশু, চির-আজ্ঞাধীনা
এ দাসী।—

তপস্যা ধ্যান ধারণা সমাধি
সকলি বিফল তার, তুমি বামদেব
বাম যায় ; দয়াময় হে জগৎ-গুরো,
গুরু-রূপে দয়া কর নিজ দয়াগুণে
তুমি যারে, ত্রিজগতে কাহার শকতি—
তাহার মুকতি রোধে ? অবিরোধ গতি
সতত কল্যাণ-পথে, সপত স্বরগ
সপত পাতাল,—সে ত করতল-গত
সবই তার ; কেশব বাসব শশী বিধি
নিরবধি নিরত সাধিতে শুভ সবে,
শিব যার অনুকূল। কহ আশু এবে
আশুতোষ, কি আদেশ এ দাসীর প্রতি।—
উর্দ্ধপদ হেটমুণ্ডে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি
রুদ্ধশ্বাসে অহর্নিশ রহি অনাহারে
সাধে যদি শতবর্ষ, কিম্বা দিগম্বর,
কেবল-কুম্ভক-সাধ্য অবরুদ্ধ রূপ,—
'অবরুদ্ধ-রূপোঽহং', বেদ-সিদ্ধ বাণী,
'কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধিঃ', জীবসাধারণে
অসাধ্য সে মহাযোগ,—জাগায়ে আমারে
মূলাধারে চতুর্দ্দলে, সহস্রারে তুলি,—
'মধ্যে সুধাব্ধের্মণি-মণ্ডপ-রত্নবেদি-
সিংহাসনোপরিগতা পরিপীত-বর্ণা'—

দেখে নিত্য, দেখা তবু নাহি দেই আমি,
তুমি অনুমতি নাথ না দিলে দাসীরে
সুপ্রসন্নে।—
কহ প্রভো, কি করি করিব
কৃতার্থ ভকতে তব ; ভকত-বৎসল,
কি দানে তুষিবে দাসে শঙ্করী তোমার
তুষিতে শঙ্করে তার, কহ তা সংপ্রতি।
দেহ আজ্ঞা, দেহ যদি, যাই শীঘ্র গতি,—
বিলম্ব না সহে নাথ,—যাই মহীতলে,
জিন-মূলে যথা দেব দাস সর্ব্বানন্দ,—
সর্ব্বতত্ত্বাভাব এবে তব তত্ত্বজ্ঞানে ;—
'প্রকাশতে মম তত্ত্বং সর্ব্বতত্ত্বাভাবে,'
সত্য সে ত হে সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি সর্ব্বথা
প্রসাদ-সাপেক্ষ তব ; ভব গুরু গতি
ভবানীর ; ভবনাথ দেহ আজ্ঞা তাই
যাই যথা সর্ব্বানন্দ,—সর্ব্বতত্ত্বাতীতে
তব তত্ত্ব-স্বরূপিণী এ দাসীরে আজ
ডাকিছে একাগ্রমনে।

শ্রীশঙ্কর।— যাও বরাননে,
যাও শীঘ্রগতি মর্ত্ত্যে, দিনু অনুমতি
সুপ্রসন্ন মনে সতি ; মনোমত বরে

বরীয়ান্ কর তারে, কাতরে তোমারে
যে আরাধে কাত্যায়নি। অদেয় কি তব
ভকতে ভকতি-বাধ্যে ? বিদ্বত্ব ভূপত্ব
ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব কিবা যা চাহিবে বৎস
দিও তারে অকাতরে, হ'ও না কৃপণা
কৃপাময়ি, এই ভিক্ষা মাগে তোমা পাশে
ভিখারী শঙ্কর তব ; অসঙ্খ্য অপার
অপরাধে অপরাধী ও শ্রীপদে যদি
হয় অবোধ, অবাধে তা' ক্ষমি ক্ষেমঙ্করি
স্নেহচক্ষে দেখো তারে,—রেখো এ মিনতি,—
বিঘ্নহরে যথা সতি। কি আর অধিক
ক'বো তোমা প্রাণাধিকে ? প্রাণের অধিক
তব ভক্ত জেনো মোর। যাও যোগেশ্বরি
যথা মহাযোগে মগ্ন অমানিশা-যোগে
যোগিবর, হে বরদে, বরপুত্র তব।—
পুরুষ-প্রবর এক পতিত তথায়
দেখিবে সে পীঠ-রূপে, ততোঽধিক প্রিয়
সে আমার,—শুন প্রিয়ে, কহিনু তোমারে,—
তোমার দাসের দাস ; আসা যাওয়া ভবে
এই বার করি শেষ, কৈবল্য প্রদানে
করিও কৃতার্থ তারে কৈবল্য-দায়িনি।—
যাও ত্বরা নিস্তারিণি ; শশব্যস্তে সবে

প্রতীক্ষিছে দেবগণ প্রতিক্ষণ দেখ
তোমার শুভাগমন! ত্রিজগদাকাঙ্ক্ষা
ত্রিজগৎ-শুভঙ্করী তুমি হে শঙ্করি।—
রক্ষিছেন চক্রধারী চক্র ধরি আজ
স্বয়ং সাধক-ধনে, দশদিক্‌পাল
দশদিকে জাগরূক, ভৈরব রূপেতে
শ্মশানপ্রহরী আমি, প্রহরী সে গৃহে,
পতিতা কনক-লতা একাকিনী মরি
ম্রিয়মাণা যথা সতী যোগনিদ্রাগতা।
না হ'তে প্রভাতা আজ অমার ত্রিযামা,
তূর্ণ অবতীর্ণা মর্ত্ত্যে হও ত্রিনয়নে।

প্রণমিয়ে পরাৎপর-পদাব্জ-যুগলে,
পরিহরি চির-রুচি কৈলাস-বিলাস,
চলিলা কৈলাসেশ্বরী বিশ্বের জননী
বিশ্বজন-কৃপাময়ী বিতরিতে কৃপা
ভূলোকে ভকতে আজ—বৃষভ-বাহনা
বরাভয়-করা মরি প্রসন্ন-মূরতি
কাতরে করুণাপাঙ্গী; সঙ্গেতে সঙ্গিনী
চৌষট্টি যোগিনী, অষ্ট নায়িকা, বিজয়া
জয়া আর।—
'জয় জয় শঙ্করী-শঙ্কর

শর্ব্বাণী-ভবানী-ভব ! ভবম্ ভবম্
হর হর বম্ বম্ !'—ভূতরুদ্র আদি
শিব-গণ শিব-গান গাইলা চৌদিকে ;
শত শত সচন্দন জবা-বিল্বদল
পড়িলা শ্রীপাদপদ্মে, জ্বলিলা সহস্র
গোরস-ঘৃতের বাতি, বিতরি সুবাস
উড়িলা ধূপের ধূম, সৌরভে পূরিল
শিবময় শিবপুর ; মহামহোৎসবে
করিলা আরতি সবে জয় জয় রবে
অম্বিকার। সে গম্ভীর আনন্দ-নির্ঘোষে
নাচে দশদিগম্বর *, নাচে চন্দ্র-তারা
আর যত গ্রহগণ ; অধীর আনন্দে
ত্রিদিবে ত্রিদশবৃন্দ, গাইলা গন্ধর্ব্ব,
নাচিলা অপ্সরঃকুল, নাচিলা কৈলাস ;
অসীম সৌভাগ্য গণি অচলা চঞ্চলা—
সে মহা-উৎসবে মহী নাচিলা উল্লাসে।

---

* (দশদিক্ + অম্বর,) অর্থাৎ দশদিকের আকাশ।

পঞ্চদশ সর্গ।

ক্রমে ত্রিযামার তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়। মেঘজাল ক্রমশঃ অপসৃত ; ইদানীং অমানিশার অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশোপবনে ক্রমশঃ দুই একটী করিয়া কাঞ্চন-কুসুমদাম বিকসিত ; বসুন্ধরা ধীরা—গম্ভীরা, সুবিশ্রান্তা সুষুপ্তা, সুশীতা শিশির-স্নাতা ! সকলই নীরব নিস্তব্ধ, নিশ্চল নিরুদ্বেগ ; সচল সবেগ কেবলমাত্র কাল,—নিঃশব্দে অদৃশ্যে অবিরাম অগ্রসর,—কোথা হইতে কোথায় যাত্রা, কবে আরম্ভ কবেই বা শেষ, কিই বা হেতু কিই বা উদ্দেশ্য,—কে কহিবে ?

পূর্ণচন্দ্র ধরাশায়ী সংজ্ঞাহীন শবাকার ! কোথায় তাঁহার সাধের 'সববা', কোথায় স্নেহের পুত্তলি ছোটবধূ, কোথায় মেহার, কোথায় ভট্টাচার্য্য-গৃহ, কোথায়ই বা তিনি,—আকাশে কি অবনীতে, ইহলোকে কি পরলোকে, দেহাবাসে কি চিন্ময় দেশে,—কিছুই আর জ্ঞান নাই !

পূর্ণচন্দ্র জীবিত না মৃত ?—জানি না কি বলিব। তদীয় সুপুষ্ট দেহযষ্টির পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট সেই সাধনের ধন সর্ব্বসুন্দর,—তিনিও তদবস্থ। উভয়ের ভাব দর্শনেই যেন বিশ্ব-সংসার সংপ্রতি বিমোহিত, বিস্মিত, নিঃস্পন্দ, নীরব ! গ্রহনক্ষত্র-গণের স্ব স্ব কক্ষে যেন সহসা গতিস্তম্ভ ! অনুমান, যেন কাল-[illegible] অধুনা অকস্মাৎ স্থগিত !—যেন বিরাট্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

সসম্ভ্রমে কাহার শুভাগমন প্রতীক্ষায়,—কোন্ আশার ধন আসিবে বলিয়া,—অবাক্, অচঞ্চল, উদ্‌গ্রীব, অনিমেষ-নেত্র!

সাধক-প্রবর অন্তর্নেত্রে অকস্মাৎ অবলোকন করিলেন,—তদীয় বক্ষঃস্থল হইতে একটী অলৌকিক জ্যোতিঃসূত্র বহির্নিঃসৃত হইল। ক্রমশঃ, সেই সূক্ষ্মাকার জ্যোতীরেখা স্থূলতঃ স্থূলতর আকার পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্মশানসর্ব্বত্রে পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল; অচিরাৎ চতুর্দ্দিক্ জ্যোতিঃসাগরে সংপ্লাবিত! অজস্রধারে সহস্র সহস্র জ্যোতিঃস্রোত দিগ্‌বিদিক্ প্রবাহিত; দশদিক্ জ্যোতির্ম্ময়! তন্মধ্যে স্বয়ং সর্ব্বানন্দও যেন দেহাস্তিত্ব-বিবর্জ্জিতে জ্যোতির্ম্ময়—জ্যোতির্ম্মাত্র,—জ্যোতিঃসাৎ—জ্যোতিঃস্বরূপ হইয়া গিয়াছেন! চর্ম্মচক্ষুর্দ্দ্বয় নিমীলিত কি উন্মীলিত, তদ্‌বিষয়ে আর জ্ঞান নাই; কেবল, কি এক অলৌকিক অদৈহিক দিব্য-দৃষ্টিতে এই দিব্যজ্যোতিঃ সম্যক্ পরিদৃশ্যমান! ক্রমশঃ ঐ জ্যোতিঃ-সমুদ্রের কেন্দ্রদেশ ঘনীভূত! ক্রমশঃ, সলিলে তুষারবৎ, নিরাকারে সাকার-সম্ভব!

তবে কি সাধন-সোপানে সর্ব্বাদৌ সাকার, আবার সর্ব্বান্তেও সাকার? সাকার কি একেবারেই অপরিহার্য্য?

এ বিচারে এইরূপই বটে; তবে, আদৌ সাকারের সাকার, অন্তে নিরাকারের সাকার। আদৌ, জড়ের দ্বারা জড় গড়িয়া, জড়-চক্ষুতে দর্শন; অন্তে, চৈতন্যের দ্বারা ঘনচৈতন্য-মূর্ত্তির আবির্ভাব করিয়া চৈতন্য-চক্ষুতে দর্শন। তখন, কখন কখন বা, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়, জড়-মূর্ত্তি চৈতন্য-মূর্ত্তি, তথা জড়-চক্ষু [illegible]

চক্ষু উভয়ই একীভূত হইয়া যায়; এবং কৃতকৃতার্থ সাধক, যথা সূক্ষ্ম চৈতন্য-শক্তিতে 'ব্রহ্মসুখানুভূতি'-লাভ, তথা স্থূল বহিরিন্দ্রিয়ে 'আনন্দ-রস-বিগ্রহের' সর্ব্বরসাস্বাদ-গ্রহণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যান। বৈষ্ণব-গোস্বামী কহেন,—যে নাসায় শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ-সৌরভের উপভোগ না ঘটে, 'সেই নাসা ভস্ত্রার সমান'। মহাজন-বাক্য অতিশয়োক্তি বা রূপক-বর্ণন বলিয়া প্রবোধ দিয়া, মনের মুখরোধ করা কর্ত্তব্য নহে। ঐ সকল বাক্য—

সত্য সত্য, পুনঃসত্য, সত্য সে সর্ব্বথা।
বুঝা'বার নহে, মাত্র বুঝিবার কথা॥

তবে সাকারে কি আর দোষ?—নিরাকার নিরুপাধিক ব্রহ্মের 'ব্রহ্ম' 'কৃষ্ণ' 'কালী' 'ঈশ্বর' 'গড্' 'খোদা' ইত্যাদি নাম-করণ-পূর্ব্বক বাগিন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করায় যদি দোষ নাই, তবে রূপ-করণপূর্ব্বক দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করাতেই বা দোষ কিসের? ঐ সকল নাম আবার ভাষা-বর্ণে বর্ণিত করিয়া—অক্ষর-চিত্রে চিত্রিত করিয়া—মসী-লেখায় লিখিত করিয়া, সেই চিত্র বা লেখা দেখিয়া বা পড়িয়া, অন্তরে ঈশ্বর-বোধের উদয় হওয়াতে যদি অপরাধ না ঘটে, তবে পটে উজ্জ্বলতর বর্ণে অঙ্কিত বা মৃৎ-পাষাণে স্থূলতর অবয়বে গঠিত মূর্ত্তি দেখিয়া, গাঢ়তর ভগবদ্-বুদ্ধির উদ্রেক হওয়ায় অপরাধ কিসে? যদি অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়াধীন করাই দোষাবহ,—[illegible] ত একাদশ ইন্দ্রিয়মাত্র,—চিন্তা দ্বারাও ত তবে

অচিন্ত্য অতীন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়াধীনই করা হইল। তবে আর উপায় কি ?

এ ক্ষেত্রে উপায়ান্তর নাই ; এদেশের ইহাই রীতি, এ ব্রতের ইহাই বিধি। যতদিন এই ভূ-তীর্থক্ষেত্রে—এই সুদূর বিদেশে, এই শারীর ব্রতে ব্রতী,—যতদিন জীব এই ভব-দ্বীপান্তরে দৃঢ়তর দেহ-কারাগারে মাত্র ইন্দ্রিয়াবলীর পরিচালনে অধিকার-প্রাপ্ত, তত দিন,—অন্ততঃ ততদিন মাত্র নেত্র-শ্রোত্রাদি মন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলিই তাঁহার সর্ব্বসিদ্ধি-লাভের অনন্য সাধন, এই সকল ইন্দ্রিয়-বাতায়নই তাঁহার—কি বহির্দৃষ্টি, কি অন্তর্দৃষ্টি,—সর্ব্বদৃষ্টি সঞ্চালনের কেবলমাত্র পথ, মাত্র এই ইন্দ্রিয়গণই তাঁহার ইহপরত্র পরিত্রাণ-লাভের করায়ত্ত উপায় ; উপায়ান্তর নাই। যতদিন সাকার দেহে নিরাকার চৈতন্য সংবদ্ধ, ততদিন, যে কোন প্রকারেই হউক, সাকার-সাহায্যেই নিরাকারের—জড়ের সাহায্যেই চৈতন্যের সাধনা করিতে হইবে। যে তীর্থে যখন গমন, সেই তীর্থের পাণ্ডাদ্বারাই তখন তীর্থ-ক্রিয়া-সম্পাদন বিধি-সঙ্গত ; অন্যথা অসিদ্ধি।

অচিন্ত্য চিন্ময় বস্তু যদি আদৌ চিন্তনীয়ই হইতে পারেন, তবে কখনও পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভবনীয় হইতে পারেন না, এই বা কোন্ কথা! অস্থির-কল্পিত চিন্তা অভ্যাসগুণে স্থির সমাধিতে পরিণত হওয়া যদি সম্ভবপর হয়, তবে কল্পিত মূর্ত্তি ক্রমে স্বরূপে পরিণত হওয়া অসম্ভব কিসে ? বটে, ঈশ্বর ঈদৃশও নহেন, তাদৃশও নহেন ; কিন্তু, ঈদৃশ বা তাদৃশ যাহা কিছু, [illegible]

কি কোন অংশে তাঁহার বহির্ভূত, না সর্ব্বাংশেই অঙ্গীভূত? যদি বল, ঈদৃশ বা তাদৃশ তাঁহার স্বল্পাভাস বা অংশমাত্র; কিন্তু সহস্র সহস্র সলিল-ঘটের প্রত্যেকটীতে প্রভাকরের সহস্র সহস্রাংশের এক এক অংশমাত্র প্রতিবিম্বিত, না প্রত্যেকটীতেই এক একটী অখণ্ড পূর্ণ মার্ত্তণ্ডের প্রতিচ্ছবি পতিত হয়? সেই রূপ, পূর্ণ জ্যোতিঃস্বরূপও যাঁহার অখণ্ড মূর্ত্তি, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও তাঁহারই অখণ্ড মূর্ত্তি, আবার তুচ্ছ তৃণকণা বা মৃৎখণ্ডেও সেই অখণ্ড মূর্ত্তিই বিরাজমান; সাধনার্থেই নানা সজ্ঞা; জড়প্রিয় জড়াবদ্ধ জীব-বুদ্ধির গাঢ় নিষ্ঠা উৎপাদনার্থে নানা গঠন, নানাভরণ। তাহা বলিয়া প্রচলিত মূর্ত্তিসমূহ কাল্পনিক নহে,—দিব্যজ্ঞানে পরিজ্ঞাত, দিব্যদৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট স্বরূপেরই প্রতিরূপ মাত্র।

তবে কি সাকারই সত্য, নিরাকার মিথ্যা?—না না, সবই সত্য, উভয়ই অভিন্নভাব, শব্দের বিসংবাদ মাত্র। 'যৈসে পানীকা মূর্ত্তি বরফ্ হৈ, ঐসে নিরাকার্‌কা মূর্ত্তি সাকার হৈ।' সাকার নিরাকার একই কথা। নিরাকার যে জ্যোতিঃস্বরূপ, সেও কি এক প্রকার সাকার নহে? তবে বল, সাকারত্ব আর নিরাকারত্ব একই পদার্থের স্থূলত্ব আর সূক্ষ্মত্ব, ঘনত্ব আর তরলত্ব।

মহাত্মা মূসা, হজ্‌রৎ মুহম্মদ গিরিগুল্মে জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন; ঈশার শীর্ষোপরি ঈশ-আত্মা কপোত-মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।* তবে কিনা সে সব মূর্ত্তি স্থূল নহে,—

দর্শনীয় মাত্র, স্পর্শনীয় নহে,—কেবল এই অর্থে নিরাকার। আবার ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সেই সকল মূর্ত্তিই স্পর্শনীয়—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ—পঞ্চপ্রকার জড়-গুণে জড়ীভূত না হইতে পারে, এ কথাই বা কে কহিতে পারে? ঈশা কহেন,—'All is possible with God'=ঈশ্বরে সকলই সম্ভাব্য।

যাঁহাদের সাকারে ন্যক্কার উপস্থিত হয়, তাঁহারাও ত জানেন,—জড় যে চৈতন্যেরই বিকার বা অবতার ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাও দর্শন শাস্ত্রের,—বিশেষতঃ হিন্দু ও খৃষ্টীয় দর্শনের একটী বিশিষ্ট সূত্র (Idealism)। তবে এখন একটু সূক্ষ্ম বিচারে বুঝুন্ দেখি, জড়-মূর্ত্তিতে চৈতন্য আরোপিত—আবির্ভূত—একীভূত হইতে পারে কি না।

সাকার বড় সহজ কথাও বটে, বড়ই কঠিন কথাও বটে। সাকারের সাকার আপাততঃ বড় সহজ, কিন্তু নিরাকারের সাকার,—সে বড় কঠিন ব্যাপার।

জলে ভাপ্ উঠে, মনে ভাব উঠে। জলের নিরাকার ভাপ্ জমিয়া ক্রমশঃ মেঘ, বৃষ্টি, তৎপরে কখন কখন সুকঠিন শিলাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ মনের ভাবও ক্রমে জমিয়া সাধন-পরিপাকে ঘনমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। মন্ত্রই ক্রমশঃ দেবাকার ধারণ করেন। কিন্তু গুরু-কৃপাই এ তত্ত্বের আদি নিদান।

"ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকং।
ন গুরোরধিকং ন গুরোরধিকম্॥"

"গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে। সে পাপী নরকে মজে।

ষোড়শ সর্গ।

"বৎস ত্বং বৃণু বাঞ্ছিতং ভো রাত্রিঃ ক্ষয়ং গচ্ছতি
শ্রীমদ্‌ভূতপতেঃ প্রধান-নগরী শূন্যা বভূবাধুনা।
অদ্যারভ্য মম ত্বমেব নিয়তঃ পুত্রঃ প্রতিজ্ঞা কৃতা
যস্মিন্ যন্‌নসি ত্বমেব কুরুষে সম্পাদনীয়ং ময়া ॥"

(ইতি শ্রীসর্ব্বানন্দতরঙ্গিণ্যাম্)

বৎস, তব যাহা বাঞ্ছা চাহ সেই বর,
অবসন্না বিভাবরী, শূন্যা এবে শিবপুরী,
কিবা মনে অভিলাষ কহ রে সত্বর।

আজি হৈতে এ প্রতিজ্ঞা করিনু নিশ্চয়,
মানস করিবে যাহা, সফল করিব তাহা,
তুমি মোর প্রিয়পুত্র নাহিক সংশয়!

অভয়ার অভয়-বাণী শ্রবণে, শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে সর্ব্বানন্দের সহসা দিব্যজ্ঞানোদয়! গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান! নয়নযুগল হইতে অবিরল প্রেমাশ্রুধারা, তথা শ্রীমুখ-পদ্ম হইতে অনর্গল অমৃতময় মাতৃ-স্তোত্র-লহরী বিনির্গত হইতে লাগিল।

অহো, আদৌ কি মহামূর্খত্ব! অহো, ইদানীং কি মহাপাণ্ডিত্য!

(১)

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ,—

"যা ভূতান্ বিনিপাত্য মোহ-জলধৌ সংনর্ত্তয়ন্তী স্বয়ং
যন্মায়া-পরিমোহিতা হরি-হর-ব্রহ্মাদয়ো জ্ঞানিনঃ!
যস্যা ঈষদ্ অনুগ্রহাৎ করগতং যদ্ যোগিগম্যং ফলং
তুচ্ছং যৎপদ-সেবিনাং হরিহরব্রহ্মাত্বম্ অস্যৈ নমঃ॥"

(২)

"যা জীবরূপা পরমাত্মরূপা যা পুংস্বরূপা চ কলত্ররূপা।
যা কামমগ্না পরিভগ্নকামা তস্যৈ নমস্তুভ্যম্ অনন্তমূর্ত্ত্যৈ॥"

(৩)

"ত্বং সর্ব্বশক্তি র্জগতাংত্রুহিত্রী ত্বং সর্ব্বমাতা সকলস্য ধাত্রী।
ত্বং বেদরূপাখিলবেদ-বাচ্যা ত্বং সর্ব্বগোপ্যা সকলপ্রকাশ্যা॥"

(৪)

"ত্বমেব হংসঃ পরমো যতীনাং ত্বং বৈষ্ণবানাংপুরুষঃ প্রধানম্।
ত্বং কৌলিকানাং পরমা হি শক্তি স্ত্বমেব তেষামপি দিব্যভক্তিঃ॥"
(ইতি সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণ্যাম্)।

(১)

মোহার্ণবে জীবগণে করি নিমগন
আপন আনন্দে যিনি নৃত্য-পরায়ণ,
বিধি বিষ্ণু শিব আদি জ্ঞানিগণ যত
যাঁহার মায়ায় সবে মোহিত সতত,

যে ফল লভয়ে যোগী মহাযোগ-ফলে,
করপ্রাপ্ত হয় যাঁর কৃপালেশ হ'লে,
হরিহরব্রহ্ম-পদ যাঁর পদধ্যানে
মানে ছার, নমস্কার তাঁর শ্রীচরণে।

(২)

জীব পরমাত্মা সবই স্বরূপ যাঁহার,
স্ত্রীপুরুষ সর্ব্বরূপে যাঁহার বিহার,
কামমগ্না হয়ে পুনঃ কামান্তকারিণী,
সে তোমারে নমস্কার হে সর্ব্বরূপিণি!

(৩)

তুমি সর্ব্বশক্তি দেবি জগৎ-দুহিত্রী,
তুমি ত্রিজগৎ-মাতা ত্রিজগৎ-ধাত্রী,
বেদরূপা, সর্ব্ববেদে তোমারই আভাস,
সর্ব্ব-গুহ্যা, তবু সর্ব্বে তুমি সুপ্রকাশ।

(৪)

তোমারেই হংসরূপা কহে যতিগণ,
তুমিই সে বৈষ্ণবের পুরুষপ্রধান,
কৌলিককুলের তুমি পরমা শকতি,
তুমিই তাদের চিত্তে অচলা ভকতি।

ভক্তের স্তুতিগানে ভবানী পরিতুষ্টা হইয়া পুনর্ব্বার বরপ্রার্থনা করিতে অনুরোধ করায় সর্ব্বানন্দ মহাশয় করযোড়ে কহিলেন,—

"হে মাতঃ, হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত শ্রীচরণাম্বুজদ্বয়-দর্শনে আজ আমার জন্মকর্ম্ম সকলই সফল, অপর বরপ্রর্থনায় আর প্রয়োজন নাই।"

হায় হায়! আহা মরি, বলিহারি যাই!—

স্পর্শমণির কি এমনই অপূর্ব্ব আকস্মিক অসীম শক্তি! রজত-রঙ্গ-লৌহ-সীশাদি সকল ধাতুই কি স্পর্শমাত্রেই তৎক্ষণাৎ সমান সুবর্ণশ্রী ধারণ করে! একাল সেকাল—সকল কালেই কি ইষ্টদর্শনমাত্রে সকল সাধকেরই মনে সমান নিষ্কামভাবের সহসা আবির্ভাব হইয়া থাকে! সেকালে ধ্রুব মহাশয়ও শ্রীভগবানের দর্শন-লাভানন্তর বরপ্রার্থনায় অনুরুদ্ধ হইয়া কহিয়াছিলেন,—

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেব মুনীন্দ্র-গুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নম্
অহো কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥"

হে দেব, আপনি মুনিশ্রেষ্ঠগণেরও অগম্য অজ্ঞেয়, আর আমি অভাজন অসার সম্পদ্ অভিলাষে তপস্যানিরত হইয়া তাদৃশ দুর্লভ ধন আপনাকে প্রাপ্ত হইলাম! তুচ্ছ কাচ-খণ্ড বিচয়ন করিতে করিতে এ যেন অভাগার ভাগ্যে মহামাণিক্য-লাভ ঘটিয়া গেল! অহো, ইহাতেই কৃতকৃতার্থ হইলাম! আর বর প্রার্থনার প্রয়োজন নাই।

অতঃপর দেবী পুনঃ পুনঃ বরপ্রার্থনা করিতে অনুজ্ঞা করায়

কৃতার্থ সাধক তখন শবাকারে ভূপতিত পূর্ণচন্দ্রের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন,—

'মা, কি বরপ্রর্থনা, তাহা আপনার এই দাসকে জিজ্ঞাসা করুন্।'

অমনি আনন্দময়ী সস্মিতে পূর্ণানন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন,—'বৎস, যোগনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর। তুমি ভব-বন্ধনে মুক্তিলাভ করিলে, আমার দর্শনলাভে কৃতার্থ হও এবং মনোমত বরপ্রার্থনা কর।'

এই বলিয়া জগদম্বা নিজশ্রীচরণাম্বুজ দ্বারা পূর্ণচন্দ্রের শিরোদেশ স্পর্শ করিলেন। অহো ভাগ্য! অহো কৃপা!

গোষ্ঠগৃহে সর্ব্বানন্দ যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,—অগ্রে পূর্ণচন্দ্রের গতিবিধান করিবেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল, অগ্রেই পূর্ণানন্দ মোক্ষভাগী হইলেন!

তবে ত যথার্থই ভক্ত অপেক্ষা ভক্তানুভক্তের,—দাস অপেক্ষা দাসানুদাসের সমধিক সৌভাগ্য!

তবে বুঝি, সমগ্র জীবমণ্ডলীকে প্রেমময়ের অনুজীবী প্রিয় পরিবার জ্ঞানে যে প্রেমিক-চূড়ামণি বিশ্ব-সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই ধন্য, তিনিই ত্রিজগৎমান্য!

তত্তাহি শ্রীশ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর শ্রীমুখাম্বুজ-নিঃসৃত প্রার্থনা-পদে,—

"ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃতস্য ভৃত্যানুভৃত্য-
ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর প্রভো॥"

প্রভো হে !—

যে জন তোমার ভৃত্য, তাহার ভৃত্যের ভৃত্য,

তার অনুভৃত্য-ভৃত্য, তার ভৃত্যজ্ঞানে,—

ভুলিও না এ দাসেরে,—রেখো যেন মনে।

তথৈব চ, অর্জ্জুন প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্য,—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন তে ভক্ততমা মতাঃ।

মদ্‌ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

সখা হে !—

মোর ভক্ত হ'লে সুধু শ্রেষ্ঠ সে ত নয়,

যে মোর ভক্তের ভক্ত, শ্রেষ্ঠ জেনো তায়।

বুঝিলাম বুঝিলাম, এ জগতে—

সেবা হি পরমো ধর্ম্মঃ, সেবকো ধর্ম্মিণাং বরঃ।

ধন্য পূর্ণানন্দের সেবা ! ধন্য পূর্ণানন্দের সৌভাগ্য ! দয়াময়ীর সদয় সম্বোধনে, তথা শবে শিবত্ব-বিধায়ক শ্রীপাদপদ্মের সঞ্জীবন-রজঃ-স্পর্শে সহসা সম্প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ণানন্দ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন,—

'জননি, দয়াপ্রকাশে দশমহাবিদ্যারূপে দর্শন দিয়া দাসের মনোরথ পূর্ণ করুন্,—ইহাই মাত্র প্রার্থনা।'

ধন্য পূর্ণানন্দের পরার্থপরতা !—

প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতী দশমহাবিদ্যা-রূপ-দর্শনে সর্ব্বানন্দের যাহাতে সর্ব্ববিদ্যায় সম পারদর্শিতা লাভ হয়,' তাঁহার এ প্রার্থনায়

ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য; এবং উদ্দেশ্যানুসারেই ফল-লাভ হইল।

মা আনন্দময়ী পূর্ণানন্দের প্রার্থনা শ্রবণে সানন্দে শ্রীশ্রীদশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন;—স্বর্গে দুন্দুভিনাদ হইতে লাগিল; মেঘগণ আকাশে অদৃশ্যে মৃদুগম্ভীরে মধুর গর্জ্জন করিতে লাগিল; দেবগণ জয়নিঃস্বনে কুসুমাসার বর্ষণ করিলেন; ধরিত্রী ধন্যা হইলেন!

সর্ব্বানন্দ, পূর্ণানন্দ, উভয়েই সচ্চিদানন্দ-সাগরে নিমগ্ন! দরবিগলিত প্রেমধারা নেত্রদ্বার দিয়া, গাত্র বহিয়া ক্রমশঃ ধরাতল পবিত্র করিতেছে; এই চর্ম্মচক্ষে দুর্ণিরীক্ষ্য—সেই সম্মুখবর্ত্তী ব্রহ্মরূপ অনিমেষে দর্শন করিতেছেন, আর বদ্ধকর-পুটে পর্য্যায়ক্রমে উভয়ে জননীর রূপগুণ-গানে নিরত রহিয়াছেন;—

(১)

শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ,—

"ঘনাকারাকারা রিপু-রুধির-ধারাঞ্চিত-মুখী
গলদ্-বেণী-ভারা গল-ললিত-হারা হর-বধূঃ।
উদারা দুর্ব্বারা সুরগণ-বিহারা সুর-রমা
ময়া মেহারে সা ভুবন-জননী দর্শনমিতা ॥"

(২)

"অসুর-রক্ত-গলিত-বক্ত্র-জলদলক্ত-রাগিণী।
ধরণি-লিপ্ত-কুটিল-মুক্ত-চিকুর-নক্ত-কারিণী ॥"

(৩)

"কলিত-খণ্ড-বিকৃত চণ্ড-দনুজ-মুণ্ড-মালিনী।
বিগতবস্ত্র-নিশিতশস্ত্র-কুণপ-মস্ত ধারিণী॥"

অথ শ্রীপূর্ণানন্দ উবাচ,—

(১)

"সুরত-কর্ম্ম-বিদিত-মর্ম্ম-গিরিশ-শর্ম্ম-দায়িনী।
অখিল-সব্য-মনন-লভ্য-ভুবন-ভব্য-কারিণী॥
অমৃত-বৃষ্টি-ভুবিকরিষ্ণিব্ পরমসৃষ্টি-পালিনি
প্রণত-বিষ্ণু-গিরিশ-জিষ্ণু-ভবকরিষ্ণু-তারিণি॥"

(২)

"নত শুভঙ্করী শব-শিরোধরা
রিপু-ভয়ঙ্করী রণ-দিগম্বরা।
জলধর-দ্যুতিঃ সমর-নাদিনী
মদ-বিমোহিতা দ্বিরদ-গামিনী॥"

(৩)

"দেব-দনুজারি-রণ ভীমরসনোজ্জ্বলা
ভীমতর-দৈত্যকর-বদ্ধ-কটি-মেখলা।
কণ্ঠ-গলদস্র-নর-মুণ্ডবর-মালিনী
সৈব মম চেতসি বিভাতি কুল-কামিনী॥"

অথ পুনঃ শ্রীসর্ব্বানন্দ উবাচ,—

(১)

"শতকোটি-দিবাকর-কান্তিযুতং
বিধি-বিষ্ণু শিরোমণিরত্ন-ধৃতং।
চলদুজ্জ্বল-নূপুর-গান-যুতং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্।"

(২)

"বিষয়ানল-তাপিত-তাপ-হরং
বিধি-শৌরি-মহেশ-বিধান-করং।
শিব-শক্তিময়ং ভয়-নাশ-করং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্॥"

(৩)

"কুসুমাকর-শেখর-ধূসরিতং
মধুমত্ত-মধুব্রত-গুঞ্জরিতং।
জগদুদ্ভব-পালন-নাশ-করং
জগদীশ্বরি তারিণি তে চরণম্॥"

অথ পুনশ্চ—

"নমো নিরাকারায় নিত্যায় সদ্‌গুণায় চিদাত্মনে।
সাধকাভীষ্ট-দানায় পাহি মাং ভব-সাগরাৎ॥"

(সর্ব্বমিতি সর্ব্বানন্দতরঙ্গিণ্যাম্)

(১)

শ্রীসর্ব্বনন্দ কহিলেন,—

নিবিড় নীরাদাকারা,
বক্ষে, রিপু-রক্তধারা,
এলায়ে পড়েছে বেণীভার,
গলে দোলে সুললিত হার ;
সুরগণ-বিহারিণী,
সুর-মন-রঞ্জিনী,
জগজ্জননী হর-দারা
হেরিনু মেহারে বামা উদারা দুর্ব্বারা !

(২)

উজ্জ্বল অলক্ত সম
অসুরের রক্তে মাখা
শ্রীমুখ-কমল,
নিবিড় কুন্তলজাল
লুটায় মাটিতে পড়ি'
আঁধারিয়া অবনিমণ্ডল।

(৩)

প্রচণ্ড অসুর-মুণ্ড
অসিতে করিয়া খণ্ড
মালাকারে পরিহিত গলে,

উন্মাদিনী উলঙ্গিনী
নিশিত কৃপাণ-পাণি
শ্রীকরে অসুর-শির দোলে।

অনন্তর শ্রীপূর্ণানন্দ কহিলেন,—

(১)

নানা-রস-বিহারিণী
মহেশ- মনোমোহিনী
ত্রিভুবন-শুভ-প্রদায়িনী,
অমৃত-বর্ষিণী মর্ত্ত্যে,
সৃষ্টি-পালন-সমর্থে,
সুরগণ শরণার্থে
প্রণমে তোমারে নিস্তারিণি।

(২)

যে তব চরণে নত,
সদা সাধো তার হিত,
শব-শির চারুকরে ধরা,
রিপুগণ-ভয়ঙ্করী,
হুহুঙ্কার রব করি'
উলঙ্গ জলদ-অঙ্গে
প্রমত্ত সমর-রঙ্গে
মাতঙ্গ-গামিনী, কাঁপে পদ-ভরে ধরা।

(৩)

লক্ লক্ সমুজ্জ্বল
ভীষণ রসনা-দল,
ভয়ঙ্কর দৈত-কর-কটিতে মেখলা।
গলিত নয়নে ধারা—
মুণ্ডমালা গলে পরা,
সে কুল-কামিনী শ্যামা
অপরূপ নিরুপমা
চিদাকাশে প্রকাশিত শতবিধূজ্জ্বলা।

পুনর্ব্বার শ্রীসর্ব্বানন্দ কহিলেন,—

(১)

কোটি দিবাকর-দ্যুতি তব শ্রীচরণ
বিধি-বিষ্ণু-শিরোমণিরত্ন-বিভূষণ;
চঞ্চল কাঞ্চন-ময় নূপুর যুগল,
রুণু ঝুনু রবে তায় ঝঙ্কারে কেবল।

(২)

প্রবল বিষয়ানলে তাপিত যে জন,
শান্তি-বারি দিয়া তারে শান্ত সুশীতল
করে ও শ্রীপাদ-পদ্ম,—বিধি নিরঞ্জন
সতত শরণাগত,—শিবের সম্বল,
শিব-শক্তিময় সে যে ভব-ভয়হারী,
জগৎ-তারণ-হেতু, হে জগদীশ্বরি।

(৩)

ইন্দ্রাদি অমরবৃন্দ প্রণত ও পায়,—
মস্তক-কুসুমমালা চরণে লুটায়,
ধরেছে ধূসর রাগ পরাগ-রেণুতে,
গুঞ্জে তায় মধুব্রত মধুর রবেতে।
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-নিদান মাত্র জানি
ও শ্রীপাদপদ্ম তব জগৎ-জননি।

পুনশ্চ,—

চিদাত্ম সদ্‌গুণ নমঃ নিত্য নিরাকার,
অভীষ্ট প্রদানে কর ভবার্ণবে পার।

ইত্যাদি বহুবিধ স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া, জগজ্জননী মহাপুরুষ-দ্বয়কে নানা বরপ্রদানে পূর্ণমনোরথ করিয়া, বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তর্হিতা হইলেন। কাক-কোকিলাদি বিহগকুল স্বস্ব-রবে সবিতার শুভাগমন-সংবাদ প্রচার করিল; শর্ব্বরী সমতীত, সুপ্রভাত সমাগত!

সিদ্ধবিদ্য মহাসত্ত্ব দেব-মানবদ্বয় প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্মশান-ভস্মাদি-ভূষিত গাত্রে প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ মৃদুল মদালস গমনে গৃহে প্রত্যাগত! উভয়েরই শ্রীমুখপদ্ম হইতে রহিয়া রহিয়া সুমধুর স্তোত্রধারা নির্গত হইতেছে; শ্রবণে দর্শনে পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত বট্‌ঠাকুর মহাশয়—সুপণ্ডিত, শাস্ত্রজ্ঞ,—সহসাই বুঝিতে পারিলেন,—আজ এ দু'জন কোন্ এক আকস্মিক অলৌকিক মহাশক্তিতে শক্তিমান্! 'আমার প্রাণের ভাই সব্বা

বুঝি আজ জগন্মাতার কৃপালাভে ত্রিকোটিকুল-পাবন মহাপুরুষ হইয়া ঘরে ফিরিল !'—ভাবিয়া গলদশ্রুনেত্রে পুলকপ্রকম্পিত-গাত্রে তিনি উভয়কে প্রেমালিঙ্গন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন।

পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমতী ছোটবধূ ঠাকুরণী—কি হেতু, কে জানে ?—আজ অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক স্নানান্তে সোৎসাহে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনে নিযুক্তা ! সত্বরই সমস্ত প্রস্তুত !

মহাপুরুষদ্বয় আজ পাবকবৎ স্বতঃপবিত্র,—শৌচাচমন-স্নানাদি অসমাপনেই মহানন্দে ভোজনক্রিয়া সমাধা করিলেন। অতঃপর আমাদের সেই মা-জননীও মহানন্দে পতির প্রসাদ-লাভে পরিতৃপ্তা হইলেন ।

পল্লীবাসিনী প্রেম-জননী প্রভৃতি শ্রীমতীগণ ক্রমশঃ আসিয়া সমুপস্থিত ! শ্রীশ্রীসর্ব্বানন্দ-পূর্ণানন্দের অলৌকিক তেজঃশ্রী দর্শনে বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজ নিজ অনুমানা-নুরূপ নানাবিধ অভিনব অদ্ভুত ইতিহাস রচনাপূর্ব্বক মেহার-সর্ব্বত্রে এই মহারহস্য-সংবাদ সুঘোষিত করিলেন। দলে দলে যুবক বৃদ্ধ বালক বনিতা আসিয়া মহাপুরুষ-দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইতে লাগিল।

মেহার আজ মহা আনন্দ-ধাম . মা-লক্ষ্মী ছোটবধূ আমাদের আজ পূর্ণানন্দময়ী !

সংগীত।

(১)

(ভৈরোঁ, কাওয়ালি)

জয়—হর মহেশ্বর, স্মরহর শঙ্কর,
ভস্ম-ভূষাকর দিগম্বর।
বোম্ বোম্ বোম্ বোম্ ব্যোমকেশ
বৃষবাহান ডম্বুর-শৃঙ্গধর॥
জটাজুটজাল-শিরে লটাপট
ভুজগভূষণ গঙ্গাধর;
রজত-গিরিনিভ শান্ত সদাশিব
মগন যোগধ্যানে যোগিবর॥
চারু চন্দ্রকলা ভালে ঝলমল
হাড় মাল গলে শোভাকর;—
তূঁ হি জগজন-জনক হে,—
ওহে—তুমি জগৎ-পিতা, বামে জগ-মাতা,
যুগল যুগে যুগে, জগ-জন-ত্রাতা;—
সরোজে মতিদাতা, নতুবা গতি কোথা,
হব বিষয়-ব্যথা হর হর॥

(ঝিঝিট, একতালা)

(২)

জয় ভগবতি গীতারূপিণী—

দুর্গতিমতি-হারিণী।

কাল বরণী কাল-ঘরণী

কাল-ভয়-নিবারিণী॥

হরি-হর-বিধি-বেদ-প্রসূতি

অসিতা সুস্মিত-হাসিনী;

সুষুমুনা-পথে বিদ্যুৎ-গতি

সদ্যঃ মুকতি-দায়িনী॥

নীলোজ্জ্বল জলদজ্যোতিঃ

দুর্জ্জয় ঘনগর্জ্জিনী;

উমেশ-ভার্য্যা অমর-পূজ্যা

সমর-সজ্জা-ধারিণী॥

নব-বিভাকর-কিরণ-বরণ

চরণ চরম-ভয়-নিবারণ;

ও পদ-সরোজ সরোজ-শরণ,

করুণা কুরু মা তারিণি॥

পরিশেষে সবিনয় নিবেদন,

শ্রীশ্রীমেহার-মাহাত্ম্য মহাকাব্যের এতাবৎ-প্রকাশে যদি বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা পাঠ করিয়া সাধুসাধ্বী পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্তরঞ্জন ও তৎসহ তাঁহাদের অন্তঃকরণে ভগবৎ-প্রেম-পিপাসার কিঞ্চিন্ মাত্রও সঞ্চার বা পরিবর্দ্ধন হইতেছে, তাহা ইহলে গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ড অবিলম্বেই প্রকাশিত করা যাইবে। বর্ত্তমান কাণ্ডে ক্বচিৎ যে দুই একটী বিষয়ের অসম্পূর্ণতা বা অসংলগ্নতা রহিল, দ্বিতীয়ে তাহার সম্পূর্ণতা বা সংলগ্নতা সাধিত হইবে।

ইতি গ্রন্থকারস্য।